বেনে বউ

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ   নভেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর

বিভাস রায়

গৌরী প্রিন্টার্স

৬৫ বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ

প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৯ ॥

বড় সুন্দর সকালটি ছিল। কিন্তু দামিন্যা গ্রামের মুকুন্দ আর তার বউয়ের গত রাতে খুব ঝামেলা গেছে। মুকুন্দর কৃষাণ বলরাম আর মুকুন্দ অনেক রাত অবধি গোহালে আটকে ছিল। মুকুন্দর বউয়ের বড় আদরের গাই রাঙামণি গত রাতে প্রথম মা হ'ল।

খুব, খুব কষ্ট পেয়েছে রাঙামণি। মুকুন্দর বউ "ঠাকুর ঠাকুর" বলছিল। সন্তান হতে মেয়েছেলে মাঝে মাঝে কষ্ট পায়, তা শোনা যায়। গাই গরু কষ্ট পায়? বউ বলছিল, ভাল ভালয়ে সুপ্রসব হোক ঠাকুর! আমি কয়ালি ডেকে গোহালিয়া গাওয়াব। গোহাল পূজা করাব।

বলরাম বলল, কষ্ট পাবে না তো কি? বনবাদাড়ে ঘুরবে, গোহালে বাঁধতে গেলে ঢুঁ মারতে আসবে। তোমার আদরে বউঠান! রাঙী মর্কট হয়েছে। বুঝলে? মর্কট!

—সুপ্রসব করাও দেওর! মানুষ নয় যে পাথাির ডাকব। সে এসে প্রসব করাবে।

—তোমার চিন্তা কেন? বলরাম থাকতে চিন্তা কর কেন?

রাতে এই সব গোলমাল! বউয়ের রাঙামণি দেখ বকনা বিইয়ে বাছুরের গা চাটছে।

মুকুন্দ বলল, নাও, তোমার নাতনি হ'ল। বলা না থাকলে····

—দেওরকে আমি নতুন কাপড় গামছা দেব, জল খাবার ঘটি।

—আর আমাকে?

—তোমাকে কি দেব? আর দেখ! দেওরকে বলো, কয়ালি ডাকুক, গোহালিয়া গাওয়াও, গরুর মঙ্গল হবে। কেমন কালো বকনা গো!

—মা দুধবর্ণ, মেয়ে কালো, এ মেয়েকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে না ?

—আহা ! ও কি মানুষের মেয়ে ? আর কালো বলে বিয়ে হয় না কার ?

—তা বটে !

—কালো গাইয়ের দুধ মিঠা, তা জান ? কালো গাইয়ের দুধ মিঠা, কালো কোকিলের ডাক মিঠা, কালো হাতের রান্না ভালো।

—কি জানি, কি করে জানব ?

—কেন, আমার রান্না খাও না ?

—কে বলে তুমি কালো ?

—গোরা তো নই। তোমার পাশে আমি ? সে যা আছি, তা নিয়ে আমার মনে কোনো দুঃখ নেই।

—আমি তো কালোতে আলো দেখি।

—তুমি বিদ্বান, কত পুঁথি পড়ো, তোমার বিচার আলাদা।

—ধরো, যদি আমি কালো হতাম ?

—বেটা ছেলের আবার কালো ধলো ! গণপতি বেনে কি এমন দেখতে ? কিন্তু বউ দুটোকে দেখ ! বড় বউ কনকাও সুন্দরী বটে, কিন্তু ছোট বউ অহনা ! যেন দেবী প্রতিমা !

—থাক, বউ ! শুনতে পারি না।

—অহনার কথা ভাবলে....কেমন করে বাপ অমন সোনার পুতুল মেয়েকে বোন সতীনের ঘরে বিয়ে দিল ভেবে পাই না।

—থাক ! রাত তো পোহাবে দুদণ্ড না যেতে। একটু তো ঘুমোবে ?

—হ্যাঁ....চলো....ঘুমোবার কালে বলি ঠাকুর ! অহনার কান্না শুনে যেন সকাল না হয়।

মুকুন্দ নিচু গলায় বলল, সকাল ! সারাদিন খাটো পেটো। বিছানায় শুলেই চোখে ঘুম আসে তোমার। আমি তো অনেক পরে ঘুমাই। কত, কত রাত অবধি কান্না শুনি ওর, কত রাত অবধি।

—মা গো!

—মনে হয় বই! দামিন্যা গ্রামের লক্ষ্মী যেন কাঁদছেন। যেন বিচার চাইছেন। বিচার পান না, সেই দুঃখে কাঁদেন।

মুকুন্দর বউ বলে, দেবদেবতার মহিমা থাকলে এমনটা হতে পারে?

—তুমি শোও বউ।

—আর তুমি?

—আমিও শোব।

শুয়েও ঘুম আসে না মুকুন্দর। আজ অনেক দিন ধরে মুকুন্দ বেনে বউ অহনার নিচু গলায় অসহায় একলা কান্না শোনে।

শুধু সে শোনে? আর কেউ শোনে না?

শোনে আর মনে হয় এ বড় অবিচার, এ বড় অবিচার!

হায়! দামিন্যা গ্রামে কি মানুষ নেই, সমাজ নেই? একেক জাতির একেক পাড়া। বেনেদেরও তো পাড়া আছে, সমাজ আছে, সমাজপতি আছে।

তারা কেমন করে এ ঘোর অন্যায় সইছে? না কি অনেক মেয়েই এমনি করেই অবিচার সয়?

মুকুন্দর মা বলতেন, কি বলতেন? বলতেন, স্ত্রীলোক বাড়ির লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে কষ্ট দিলে সংসার জ্বলে যায়।

মুকুন্দ বলত, কে কাকে কষ্ট দিল? তোমার এত ভাবনা কেন?

—মুকুন্দ, তুই কি বুঝবি? অত্যাচার অনাচার তো এ বাড়িতে দেখিস নি?

সত্যিই দেখে নি মুকুন্দ। বাবাকে আর বড় দাদাকে তো তেমন কাছে পায় নি। মা ছেলের শান্তির সংসার। বউ তো মায়ের মেয়ের অধিক ছিল।

আসলে মুকুন্দর মন বড় নরম। পশু বলিও সে দেখতে পারে না। কুকুরকে ঢেলা মারলে তার বুক ফাটে।

অথচ সেই শোনে অহনার কান্না।

মনে মনে মুকুন্দ বলে, অহনা যদি দজ্জাল হত, কনকা এমন জো পেত না। যে নিতান্ত অসহায়, নিষ্ঠুরের অত্যাচার তার ওপরেই এসে পড়ে।

এ সব ভেবেই মুকুন্দ চোখ বুজেছিল, কিন্তু সকাল না হতে দামিন্যার আকাশ যেন খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল।

দামিন্যা গ্রামের আকাশ চিরে গেল এক বালিকার আর্ত কান্নায়।

আর, এক রমণীর চিল চিৎকারে। কনকা, কনকা, গণপতি বেনের বড়বউ কনকা!

কনকা মুখরা, আজও সে মা হয়নি। অপুত্রকা মেয়ের যৌবন টসকায় না। কনকাকে দেখলে ভ্রম হয়। মনে হয় বয়স থেমে গেছে, দেহের বাঁধন আলগা হয় নি।

কনকা খরহাতে কাজ করে, শাণিত গলায় কথা বলে। আবার পাড়াপড়শির বিপদে দৌড়য়, দোষেগুণে মানুষ।

ঘরে সতীন আসার পরেও কনকা এমন মূর্তি ধরে নি।

গণপতি বেনে বিদেশে যাবার পরে আজ কিছুদিন ওদের বাড়িতে চলেছে লঙ্কাকাণ্ড। সেও এক তরফা। ছোট বউ অহনার কান্না শোনা যায়, কনকার গলায় বিষ উছলায়।

মুকুন্দর বউ এগিয়ে গিয়ে জানলায় কান পাতল। তার মুখ সাদা।

—জানলা বন্ধ করো বউ।

বউ ওর কথা শুনতে পেল না। অস্ফুটে বলল, পিশাচী! পিশাচী!

সম্ভবত গণপতির আতাপিসি বলল, বড় বউ! পাড়া জেগে উঠল যে? এ কি কাণ্ড মা?

—চুপ করো তুমি, আমার সতীনকে আমি শাসন করছি। পাড়ার লোকে বলবে কি?

—সতীন তো আরো ঘরে আছে, না কি নেই ?

—এর মত অলক্ষী ? দোরে জল ছড়া পড়েনি। কোনো বাসিপাট সারা হয়নি। রাক্ষুসী দোর বন্ধ করে মুড়ি খাচ্ছে দেখ ! ছি ছি ! মেয়েমানুষের এত লোভ নোলা ?

একটি সক্রন্দন বালিকা কণ্ঠ শোনা গেল, কাল হতে খেতে দাওনি। আমার খিদে লাগে না ?

—এ কি তোর বাপের বাড়ি ? সকাল না হতে মা এসে দুধের সর আর মুড়কি খাওয়াবে ?

—দুধ মুড়কি কে চেয়েছে ? কাল নিজে খেলে, ভাতবেন্নুন জলে ঢেলে আমাকে খেতে দিলে না। এ আমার ঘর নয় ? ঘরে সব থাকতে আমাকে উপোসী রাখবে কেন ?

—আবার মুখে মুখে চোপা !

ছপাত্ ছপাত্ মারের শব্দ শোনা গেল।

—অ দিদি গো ! তোমার পায়ে পড়ি গো ! মার খেয়ে খেয়ে আমার অঙ্গে আর জায়গা নেই গো....

—তোরে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেললে আমার রাগ যাবে না।

—ওরে বাবা রে ! দামিনন্যাতে কি মানুষ নেই রে। কেউ বাঁচায় না আমারে....

হঠাৎ সব নৈঃশব্দ্য।

বউ বসে পড়ল মেঝেতে।

—শোন কেন, বউ ? পরের ঘরের কথা শুনতে আছে ?

—শুনতে....মিঠা লাগে বলে শুনি কি ? একে তো বাতাসে কান্না ধায়। আর বুক ফেটে যায় আমার।

—সত্যি, নিত্য নিত্য এ আর সয় না।

—অহনাই তো বলল, দামিন্যাতে কি মানুষ নেই ? হ্যাঁ গো, সবাই তো মানে গনে তোমায়। তুমি এর বিহিত করতে পার না ?

—গণপতি থাকলে বলতাম। মেয়েছেলের সংসার, আমার বলা সাজে? অন্য বেনেরা বা কিছু করে না কেন?

—কনকার জিভে বিষ, চোখে আগুন। সবাই ভয় পায়।

—ভেবো না অত।

—কেমন করে এমন পাষাণ হ'ল কনকা? বাঁজা মেয়েছেলে! সন্তান হলে তো অহনার বয়সী হত, না কি? বাঁজী!

—বাঁজী আবার কি?

—আ গো, অপুত্র—অকন্যা মেয়ে মানুষকে বাঁজীই বলে। কনকার সন্তান হয় নি বলেই তো একে বিয়ে করল বেনে। কেন যে করল। মেয়েটা যে মরে যাবে।

—যে দুঃখের নিরসন করতে পারবে না, তা নিয়ে ভেবে মরো কেন?

—সন্তান কপালে নেই, হয় নি, কনকা কি তা মানবে? পিতুলির কাকা তো পরপর চারটে বিয়ে করল, সন্তান কি হল? শেষের বউটা! আহা কড়ে আঙুলের মত কচি মেয়েটা গো। বিয়ের দু'বছর না যেতে বিধবা। কচি বয়সে থান পরে বাপের সংসারে দাসী হতে গেল।

—কপাল।

—কিসের কপাল! কেমন বিধান তোমাদের গো? বাহাত্তুরে বুড়ো কচি মেয়ে বিয়ে করে?

—বিধান! দেশাচার।

—আহা এখন থেকে দশমী, একাদশী, মাথা মুড়োনো, কত কষ্ট!

—হয়তো ওর কপালে বৈধব্যযোগ লেখা ছিল।

বউ বড় দুঃখে ঈষৎ হেসে বলল, অহনার কপালে যেমন সতীন ঘর লেখা ছিল! যত দুঃখ সব মেয়েমানুষের কপালে লেখে কেন গো?

—আমি লিখি?

—কোন্ বিধাতাপুরুষ লেখে ? আমি যদি তার দেখা পেতাম একবার !

—কি বলতিস বউ ? সকল মেয়েকে আমার মত ঘর বর দিও ?

—সে কি হয় না কি ? তবে বলতাম, ঠাকুর ! সকল মেয়েরে সধবা রেখো। কোলেকাঁখে ছেলেমেয়ে দিও। সতীনের জ্বালা দিওনা ঠাকুর।

—ধর তোরই সতীন আনি যদি ?

—আনতে পারো। সে আগদুয়োর দিয়ে ঢুকবে, আমি খিড়কি দিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাব।

—যাবি কোথায় ?

—যেথা হয় যাব। কাটোয়া, নবদ্বীপ, ডুমুরপুর, জায়গা কত আছে।

—যা দেখি আমাকে ছেড়ে ?

—ছি ছি ! দিনেমানে হাত ধ'রনা।

—কেন, কি হ'ল ?

—মা সগ্যে যেতে তোমার সাহস বেড়েছে খুব। দিনেমানে অশৈল ! যদি শিবু বা শিউলি এসে পড়ে ?

মুকুন্দ বউয়ের হাত ছেড়ে দিল।

—এলে বা কি দেখত ? বাবা মায়ের হাত ধরেছে বই তো নয়।

—না, লোকে কি বলবে ? বেটাছেলের তো দোষ হয় না। বলবে, মুকুন্দর বউকে দেখ ! শাশুড়ি চোখ বুজেছেন, আর একাঘরে একেশ্বরী হয়ে সে বেহায়াপনা করছে।

—বড্ড গিন্নি হয়েছিস তুই।

—ছি ছি ! এখন কি তুমি ছোট আছ, না আমি ছোট আছি, যে তুই মুই কর ? আমার কাজ আছে, যাই।

—যাও, আমিও কাজে যাই। মায়ের কথাটা বললে বলে বলছি। মা ভাল সময়ে গেছেন বউ !

—কেন····নতুন কিছু হল ?

—দেশের হাল তো ভাল বুঝি না। সবাই বলে, এমন চললে বুঝি বা দেশ ছাড়তে হয়।

—কি বলো, সকালবেলা ?

—পাঁচজন যা বলে। যা হোক, এ কথা কারেও বল না।

—আমি তো পাড়া বেরিয়ে গল্প করে কুল পাই না।

—তোমাদের গজালি তো ঘাটে। ঘাটে গিয়েও বল না। ধর যদি যেতেই হয়, মাকে নিয়ে যেতাম কি করে ?

বউ, ঘরে টাঙানো আড়বাঁশে কাপড় ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলল, যেমন করে হোক! থাকলে নিয়ে যেতেই হত। মা বলে কথা! এখনো মনে হয় বাড়ি জুড়ে আছেন। সর্বদা আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। আমি যাই গো!

মুকুন্দ আড় বাঁশ থেকে চাদর নিল। ঘরের কোনা থেকে তাল-পাতার ছাতা। এখন সে দত্তবাড়ির গৃহদেবতার পূজায় যাবে। তার পূর্বপুরুষকে দত্তদের পূর্বপুরুষ বীরদিগর দত্ত দামিন্যা এনে বসত করিয়েছিলেন। জমিজমা তিনিও দেন, পরে পিতামহ আরো জমি কেনেন। আর গোপীনাথ নন্দীর পিতা তালুকদার ভূষণচন্দ্র নন্দীর কথাই বা কেমন করে ভোলা যায় ? পাঁচ কুড়া জমি এক কথায় দান করলেন মুকুন্দর পিতাকে।

সরস, সুন্দর জমি। প্রতি বছর ওই জমিতে শালি ধানের চাষ করে মুকুন্দ। ধান, বিরিকলাই, কুমড়ো, লাউ, শশা, ঝিঙা, মরিচ, কোন জিনিসটা কিনতে হয় না।

ব্রাহ্মণ বসত করিয়ে, তাঁকে জমিজমা দিয়ে, বীরদিগর দত্ত বলেছিলেন, ভুলেও দামিন্যা ছেড়ে যেও না ঠাকুর। নানা জাতি এসে বসত করাই, দামিন্যাকে সাজিয়ে তুলি, এ আমার অনেকদিনের বাসনা। কামারদেরে আমি আনলাম, নইলে পাশের গ্রামে যেতে হত। তুমি থাকলে ক্রমে ক্রমে আরো বামুন আসবে। বামুনপাড়াই হয়ে যাবে একটা।

সেই থেকে মুকুন্দরা দত্তদের গৃহদেবতার পূজা করে। অতি

সুন্দর অষ্টধাতুর কৃষ্ণমূর্তি। পূজার ঘরও সুন্দর! দত্তরা ইঁট পুড়িয়ে দালানবাড়ি করেছিল, দীঘির পাড় বাঁধিয়েছিল, আর এক প্রচণ্ড খরার বছরে বীরদিগরের ছেলে দিগম্বরের স্বপ্নে গৃহদেবতা এসেছিলেন, বলেছিলেন, জল দে দিগম্বর, জল দে, দামিন্যা কাঁদছে।

দামিন্যার গ্রামদেবতা শিবের মন্দিরের পথে দিগম্বর প্রদত্ত কৃষ্ণ দীঘি এখন সারা গ্রামের জলতৃষ্ণা মেটায়। দীঘির নিচে এক বৃহৎ কূপ আছে। বর্ষার গড়ানে জলের জন্য কৃষ্ণদীঘি বসে থাকে না। সম্বৎসর সে কানায় কানায় টইটম্বুর। তিনদিকের পাড়ে আম, তেঁতুল, কাঁঠাল গাছ। একদিকে ঘাট। বাল্যকালে মুকুন্দ ওর সমবয়সী ওদেরই রাখাল বলার সঙ্গে কৃষ্ণদীঘি পাড়ের গাছে গাছে কত না কাঁচা আম, কত না এঁচোড় পেড়েছে।

এখন বলরাম মুকন্দর কৃষাণ, আর বলার ছেলে হলধর মুকুন্দর গরুবাগাল।

মুকুন্দ বেরিয়ে এল। খুব একঘেয়েমির বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছে জীবন। নিজ গৃহদেবতার নিত্যপূজো, দত্তবাড়ির গৃহবিগ্রহের নিত্য পূজা, মাঠে যেয়ে চাষবাসের তদারক করা, ধানচালের বৃত্তে বাঁধা জীবন।

মা থাকতে মাঝে মাঝে বলত, কি বংশে কি ছেলে জন্মাল মা!

দৈবকী বলতেন, দুঃখ হয়, বাছা?

—বড় সাধ যায় কিছু লিখি।

—সময় আসুক লিখবি।

—এত পড়েশুনে কি করলাম! ছেলে তার জ্যেঠা, পিতামহ, প্রপিতামহের নাম দেখে গর্ব করবে শুধু।

—আমি তো তোরে নিয়ে গর্ব করি।

—কিসের গর্ব মা?

—তুই বুঝবি না।

মা সনিশ্বাসে বলতেন।

জানে। মুকুন্দ জানে। ছেলে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে,

বিদ্বান বলে সম্মানিত। সে যে ঘরে আছে, সংসার দেখছে, এতেই মা নিশ্চিন্ত। কিন্তু মনের ভিতর যে মন আছে, সে তো মুকুন্দকে মাঝে মাঝে দংশায়।

যখন বংশকারিকাটি দেখে।

গাঁই কয়াড়ি, রাঢ়ী শ্রেণী, সাবর্ণ গোত্র।

পিতামহ জগন্নাথ "মহামিশ্র"। পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদ জগন্নাথ গোপাল আরাধনায় মগ্ন চিত্ত ছিলেন। জগন্নাথ বৈষয়িক ছিলেন না। বস্তুত, মুকুন্দর পূর্বপুরুষরা বিষয়গত চিত্ত ছিলেন না।

প্রপিতামহ মাধব ওঝা যখন কোন রাজ্যে ধর্মাধিকরণিক ছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় বিদ্বান, ন্যায়জ্ঞ ছিলেন। কেন তিনি কর্ণপুর ত্যাগ করেন, কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পান বীরদিগর দত্ত, কবে তাঁকে দামিন্যা এনে বসত করান, মুকুন্দ কিছুই জানে না।

পিতা হৃদয়চন্দ্র, তিনিও পাণ্ডিত্যের কারণে "গুণীরাজ মিশ্র" বলে আখ্যাত হতেন। পিতার কথা মুকুন্দর অল্পই মনে পড়ে। মায়ের ঘরে কুলুঙ্গিতে পিতার যে কাষ্ঠপাদুকা জোড়া থাকত, তা দেখে মনে হয় লম্বা চওড়া মানুষ ছিলেন। পায়ের চেটো ছিল বেশ বড়। মা বলেন, মাথা নুইয়ে ঘরে ঢুকতেন। নচেৎ কপালে ঝুনকাঠ ঠেকে যেত। মুকুন্দর পিতার কথা অল্প মনে পড়ে এ জন্য, যে মুকুন্দর জন্মকালে তাঁর দাদা অনেক বড়।

শেষ বয়সের সন্তান দৈবকীর। জন্মের পর কতদিন অবধি মনে হয়নি এ ছেলে বাঁচবে। বড়ই রোগা, গলার স্বর ক্ষীণ, মাই টানতে না টানতে হাঁপিয়ে যায়। পেট ভরে না কখনো, তাই বড়ই কাঁদে। দৈবকী ছেলে কোলে নিয়ে শুধু কাঁদতেন।

শেষে গ্রাম সম্পর্কে, ডাক সম্পর্কে পিসি ব্রহ্মকেশব মিশ্রের বড় বউ এসে দাঁড়ালেন। জেঁওচ পোয়াতি তিনি। গর্ভের সন্তান সবগুলি বেঁচে আছে। তিনি এসে ব্যবস্থা করলেন ছাগলের দুধে জল মিশিয়ে পলতে করে খাওয়াও। দিনে বিশ বার খাওয়াও একটু একটু করে।

কবিরাজবাড়ি থেকে তেল তৈরি করে আনিয়ে কতদিন, ছ'মাস ধরে তিনি মুকুন্দকে ঘষে ঘষে মাখাতেন। চোখে কাজল, কপালে কাজলের টিপ, মনসাপাতায় ঘিয়ের কাজল পাড়তেন আর টেপা ঠোঁট আরো টিপে বলতেন, বউঠান কি সব ভুলে বসে আছ। দৈবকী বলতেন সত্যিই তাই।

প্রথম সন্তান ছেলে। তারপর কয়েকটি গেল আঁতুড়ে। যে বয়সে মানুষ ঝাড়া হাত পা হয়, মেয়ের শাশুড়ি হয়, ছেলের বউ আনে, সেই তিরিশ বছর বয়সে মুকুন্দ কোলে এল।

কাঁথা-কানি-কাজললতা-ঝিনুকবাটি, এ সবের পাট যখন মুছে গেছে।

দৈবকী বললেন, কত কপালে ঠাকুরঝি! তোমার মত ননদ পেয়েছি বল!

গ্রামে তো সবাই সবার ডাকের সম্পর্কে পিসি, খুড়ী, জ্যেঠি, কাকা, দাদা! তা এই পিসি বললেন, দেখো! এই ছেলে তোমার নাম উজ্জ্বল করবে। বিদ্বান বংশ, বিদ্বানের ঘর!

—যেন সংসারী হয়।

—বড় ছেলেকে বিয়ে দাও।

—এখন তো ফাঁড়া আছে ওর, তোমার দাদা বলেন।

—ফাঁড়া কাটবে কবে?

—ওর বিশ বছরে। তার আগে বিয়ে দিলে…ছেলে গৃহত্যাগী হবে।

সে ছেলে তো গৃহত্যাগী আগেই হল। মেধাবী, পুঁথিগত প্রাণ, সে ছেলে সংস্কৃতে কি শ্লোক লিখল, ধন্য ধন্য পড়ে গেল। নবদ্বীপে গিয়ে মহাখ্যাতি পেল, "কবিচন্দ্র" উপাধি। তারপর চলে গেল ত্রিবেনী।

আর তো সে ফেরেনি। কবিযশোখ্যাতি তাকে না কি নিয়ে যায় দূর দূর নগরে। মুকুন্দ আজও জানে না, অগ্রজ আছেন, না নেই। দৈবকী বলতেন, নিশ্চয়ই সন্নেসী হয়ে গেছে ও। সন্ন্যাসযোগই

ছিল ওর, তোর বাবা তা বলেন নি।

আর পিসিমা বলতেন, কি সন্নেসের হাওয়া এনে দিয়ে গেল নিমাই সন্নেসী! কত ছেলে ঘর ছেড়ে গেল, এখনো যাচ্ছে।

দৈবকী মলিন হেসে বলতেন, হ্যাঁ ঠাকুরঝি! ঘরে ঘরে শচীমাতা!

মুকুন্দর জন্যে নিমকাঠের পেটারিতে, নিমকাঠের পাটায় বাঁধা শত শত পুঁথি রেখে পিতা মারা যান।

দৈবকী তাই মুকুন্দকে পায়ে বেড়ি দিয়ে দিলেন। আট বছরে উপনয়ন, বারো বছরে বিয়ে। নিত্যপূজা গৃহদেবতার, দত্তবাড়িতে পূজা, বলরামের বাবা জটাইয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে মাঠে যাওয়া, ক্রমে চাষবাসে জড়িয়ে পড়া, দৈবকী ছেলেকে সংসারের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন।

মুকুন্দ জড়িয়ে গেছে।

একসময়ে মনে হত বন্ধন। এখন তো জীবনের এ নিত্যবৃত্ত ছাড়া অন্য জীবন ভাবতেই পারে না মুকুন্দ। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে! মা নাম দিয়ে গেছেন শিবরাম আর চিত্রলেখা। মুকুন্দ বলেছিল, মা! ছেলে নয় "শিবু" হয়ে গেল। পুতুলের মত এতটুকু মেয়েকে "চিত্রলেখা" নাম দিলে?

—ওই যে কি পড়ছিলি সেদিন, নামটি শুনলাম। কেমন জড়োয়া গয়নার মত নাম!

—ডাকবে কি বলে?

মা সলতে পাকাতে পাকাতে বললেন, ভরা আশ্বিনে জন্মালে, নতুন গাছে শিউলি ফোটে এবার, ওকে ডাকব "শিউলি" বলে।

রাতে মুকুন্দ পিতৃপুরুষের রেখে যাওয়া পুঁথি নিয়ে বসে। অনেক, অনেক পড়েছে মুকুন্দ। সংস্কৃত তো বটেই। জমিজমার জন্য ডিহিদার, সেরেস্তাদারের কাছারিতে যেতে হয়। ফরাসীটুকু না জানলে চলে না। মনে মনে ভাবে, অধীত বিদ্যা কোন কাজে লাগবে না, তা কেমন করে হয়?

মাঝে মাঝে তালপাতায় আঁচড় কাটে।

বউ বলে, কি কর, লেখা লেখা খেলা ?

—যখন যা মনে আসে, লিখে রাখি।

—কি জানি! দেখলেও তো বুঝব না।

—এসব পুঁথি বউ! সাত রাজার ঐশ্বর্য বললে হয়।

—সে তো বটেই।

—শিবুও পড়বে একদিন।

ভাবতে ভাবতে চলতে চলতে, মুকুন্দ থমকে দাঁড়াল। বিনবিন করে কে কাঁদে ? খুব ক্ষীণ এক বালিকা কণ্ঠ।

মস্ত পিতলের কলসে জল নিয়ে একটি বালিকা আসছে। বেনে বউ অহনা।

মুকুন্দ পথ ছেড়ে পাশে উঠে দাঁড়াল। বালিকা নয়, চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বালিকা বলে না কেউ। এ বয়সে মেয়েরা মা হয়।

কিন্তু অহনা যেন শুকিয়ে গেছে, ছোটখাট হয়ে গেছে। রুক্ষ চুলে ঝুঁটি, দু'হাতে শঙ্খ, বাঁহাতে লোহা। কান ও গলা আভরণ-হীন। চোখেমুখে কান্না। আশ্চর্য সুন্দর দীর্ঘপক্ষ চোখ দুটিতে কত না বেদনা।

পিতলের কলসটি যেন অহনার মতই বড়সড়।

তার পিছনে পিছনে আসছে ওদের আতা পিসি। মুকুন্দ সরে দাঁড়াল। ওরা চলে গেল, কিন্তু মুকুন্দর মনে এক রেখাচিত্র এঁকে দিয়ে গেল। এ চিত্র আর মোছা যাবে না, পাষাণে আঁকা খোদিত ছবি যেন। মুকুন্দ তার অন্তরতম অন্তরের চারদিকে পাষাণের পাঁচিলে ঘিরে রাখে।

তাই ও অহনার আর্তনাদ শুনে ব্যথা পায়, আবার বউকে বলতে পারে, পরের ঘরে কি হয়, তা শোনো কেন ?

কিন্তু আজ যে পাষাণ ফেটে যাচ্ছে, অশ্রু উদ্বেল হয়ে উঠছে বুকে!

মন বলল, মা রে! তুই যে নিষ্কলঙ্ক দেবকন্যা। মানুষের হাতে এমন লাঞ্ছনা হলি ?

মুখে কিছু বলল না।

অহনা চোখ তুলে মুকুন্দর চোখে চোখ রাখল। অহনাকে যেন নিশিতে ডেকেছে। চোখ খোলা, কিন্তু মুকুন্দকে দেখতে পাচ্ছে না। অহনার সুগৌর বাহুতে, উদলা পিঠে কালশিটের পর কালশিটে।

ওই কালশিটের দাগ যেন বলে গেল, দামিন্যা গ্রামে মানুষ নেই কেউ। থাকলে রমনীর এ নির্যাতনের প্রতিকার করত।

অহনা চলে গেল।

মুকুন্দর চোখ জ্বালা করে জল ভরে উঠল। একাধিক বিয়ে দেশাচার অহনা, বউ বাঁজা হোক বা পুত্রবতী, সতীন আনে স্বামীরা। কিন্তু এ দেশাচার যে কত নিষ্ঠুর, ওই বিহ্বল, আর্ত, বালিকার চোখ বলে দিচ্ছে।

অথচ, এমন কিছুই হয় নি, যা প্রত্যহ ঘরে ঘরে হয়না।

দুধে সরে মানুষ করে অহনাদের বাবারা স্বচ্ছন্দে সতীন ঘরে বিয়ে দেয় ওদের। এমন তো হয়ই সমাজে।

সতীনরা অহনাদের মারে ছেঁচে, কষ্ট দেয়। কখনো সতীন, কখনো শাশুড়ি, কখনো ননদ।

অহনারা জলে ঝাঁপ দেয়, গলায় দড়ি দেয়, বিষ খায়।

সবাই ছি ছি করে। আত্মহত্যা মহাপাপ। তাই আত্মঘাতিনীর শ্বশুর গুষ্টিকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

এ তো দেশাচার, এতো চলে আসছে।

পাঁয়ষট্টি বছরে পিতুল ঠাকুর ন'বছরের কুসুম্বিনীকে বিয়ে করতেই পারে। আবার এগারো না হ'তে কুসুম্বিনী থান পরে ফিরে যেতেই পারে।

এ রকম তো ঘটেই সমাজে। কিন্তু অহনার চোখে যে বিলাপ ছিল, দামিন্যাতে মানুষ নেই রে।

মুকুন্দ কি করবে ?

গণপতির ওপর রাগ হ'ল। বাঘিনীর হাতে ছাগলছানার ভার দিয়ে বিদেশে গেলে বা কেন?

মুকুন্দ নিশ্বাস ফেলল।

"নিম তিতা, নিসুন্দা তিতা, তিতা মাকাল ফল
সবার অধিক তিতা কন্যা, বোন সতীনের ঘর।"

এ কথা কি অহনার বাবা জানত না?

মুকুন্দর মন বাস্তবে ফিরে এল। সম্ভব হলে অহনার পিত্রালয়ে খবর দেবে। তাদের মেয়ে, তারা যা পারে করুক।

॥ ২ ॥

গণপতির সংসারটি ছোট। বড় বউ কনকা, যার বাপের বাড়ি বলতে নেই। ছোট বউ অহনা, যার বাপের বাড়ি সবাই আছে। অহনা বাপের সোহাগী, মায়ের আদরিণী, কোষ্ঠীতে ফাঁড়া ছিল বলে চৌদ্দ বছরে পড়ে তবে বিয়ে হ'ল।

আর আছে আতা পিসি। বিন্দুবাসিনী নামে কেউ কখনো ডাকে নি। চিরকালই "আতা"। আতা পিসির কবে বিয়ে হয়, কবে সে বিধবা হয়, তা ভাবলেও ওর মন বিষিয়ে ওঠে।

এমন নয় যে গণপতির নিজের পিসি। তবে গণপতির মা ছিলেন বিচক্ষণ, রাশভারী মানুষ। আতাপিসিকে তিনিই নিয়ে আসেন।

আতাপিসি বলে, কি বলব বাছা! আনার কালে কত গল্প। আমার ঘরে কাজ নেই মোটে। খাবি আর গল্পগাছা করবি। সময়ে তীর্থ্যদশ্যন করাব, জগন্নাথ দেখিয়ে আনব।

ঘাট, পুকুর ঘাট হ'ল মেয়েদের কথা বলার জায়গা। মেয়েরা এ-ওর গায়ে মাথায় ক্ষার খৈল মাখায়, কাপড় কাচে, কথা বলে। তারা বলেছিল, করেছিলে তীর্থ্যদশ্যন?

—নিত্য নিত্য দশ্যন করেছি বাছা, এখনো করছি। কাঁথা মাদুর কাচো, ঘরদোর নিকোও, ধান ভাপাও, চিড়ে কোটো, মুড়ি ভাজো,

মুনিষ কিষাণকে খেতে দাও, আকাশের ঠাকুর পশ্চিমে হেলবে তখন খাও।

—চলে যাও না কেন, অ পিসি?

—কোথা যাব বলতে পারো?

—রেগে বেরিয়ে যাও, কে ধরে রাখবে?

—যাবার জায়গা কোথা রে মেয়ে? এ জীবন এখানেই যাবে।

—আসলে তোমার গিন্নি হবার শখ!

—গণার মা রইতে হেঁসেল ছাড়বে?

মেয়েরা এ-ওর দিকে চায়। হেঁসেল যার হাতে, সেই গিন্নি। এ তো সবাই জানে।

—তিনি তো চিরকাল থাকবেন না।

—আ গো! গণার মায়ের জেয়াদা বুদ্ধি। গণার বউ কনকা? হ'লে বা দশ বছুরে মেয়ে, তাকেই রাঁধতে বাড়তে সাথে নেয়। আমি কি পিসি? দাসী এনেছিল, দাসী। মরার কালে ও দাসীই থাকব।

—গণার বউটা ভারি খরখরি।

এরপর কার বউ পঙ্গু শাশুড়িকে আধপেটা খেতে দেয়, কার সতীন, সতীন-বিটিকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে ডুবিয়ে মেরেছিল, কার বা বউ স্বামীকে নিজের ভেড়ো করে রেখেছে, সব কথা জমে ওঠে।

আতাপিসি বলে, যাই বাছা! মাগীর মুখ তো জানো না, বিষ ঝরে মুখে।

সবটা সত্যি নয়, সবটা মিথ্যেও নয়।

গণপতির মায়ের তিন ছেলে, চার মেয়ে। মেয়েরা যে যার শ্বশুরঘরে গেছে।

গণপতির বাবা বহুবছর আগে পরলোকে গেছেন। সংসার বেঁধে তুলেছেন ওর মা। সে জন্য দামিন্যার বেনে সমাজ বলে, গণার মা মেয়েছেলে না হয়ে বেটাছেলে হলে ভাল হত।

সমাজে যা ঘটেনি, তাই তিনি ঘটালেন। তিন ছেলেরই বিয়ে হয়েছে, গণপতি ছোট। মায়ের আহ্লাদে গণপতি পায়রা ওড়াতে যায়, নৌকো বাইতে যায়।

যদুপতি ও শ্রীপতি এ জন্য অসন্তুষ্ট। সবই বোঝেন ওদের মা। বড় বউ, মেজ বউ আর ছোট বউ কনকা।

কনকা তাঁর কাছে শোয়। দু' বউয়ের তাতে ঘোর হিংসা।

বেনের মেয়ে তিনি, বেনের বউ। সুবর্ণবণিকদের সে দিন নেই, যে সিন্ধুকে সোনা থাকবে, রাজাগজা ভয় পাবে তাকে।

শুনেছেন, কোন্ বা রাজা সুবর্ণবণিকদের দবদবা সইতে পারেনি। তাদের জাতের ওপর অবিচার করেছিল।

কিন্তু তিনিও তো বীরদিগর বেনের মেয়ে। সোনা না হোক, নৌকাপথে সাত সামগ্রীর ব্যবসা করতে দেখেছেন বাপকে।

তিনি একদিন বড় ছেলে, মেজ ছেলেকে ডাকলেন। বললেন, খাই না খাই, এমন ঝগড়া করব না যে লোকে জানবে। তোমাদের জন্য যদু! আমার বাড়ির নাম ধুলোয় মিশে গেল। কিসের এত বিবাদ বলতে পার? গনা তোমাদের ছোট ভাই হয়!

ছেলেরা এ-ওর দিকে চাইল।

—দামিন্যার মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে এমনই হবে। কি আছে এখানে? চাষ করছ, ধান আসছে, সু'বছরে ধান বেচছ!

—কি করতে বল তুমি?

—তোমাদের বয়স আছে, খাটবার ক্ষমতা আছে, অন্যত্তর যেয়ে চেষ্টা করে দেখ না ব্যবসাপাতি হয় কি না।

বেনে সমাজপতি বলেছিলেন, হওয়ালেই হয়। যদুর শ্বশুরবাড়ি সপ্তগ্রাম, শ্রীপতির শ্বশুরবাড়ি বর্ধমান। সে সব জাঁকালো নগর। শত শত দোকানপাট আছে বলে শুনি। হওয়ালেই হয়, কিন্তু যদুর মাকে শুধাও তিনি কার কাছে থাকবেন?

মা যদুপতির মুখ দিয়ে জানালেন, এদের সংসার আছে, সন্তান

আছে, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যাতায়াত আছে। গণপতির বউয়ের মা হবার বয়স হয়নি। আমি এখানেই থাকব।

—যদুপতি! মাকে বলো, তিনি গণপতির ভরসায় থাকবেন.... সে তো ভরসাযোগ্য নয়।

—সে জন্যই তার আমাকে দরকার।

এ ভাবেই সব ঠিক হয়ে যায়। ধ্বজাপূজার পবিত্র দিন পার করে যদুপতি ও শ্রীপতি সেথোসাঙ্গাত নিয়ে দেশান্তরী হয় সপরিবারে। দামিন্যাসহ দশটা গ্রাম শিউরে ওঠে যেন। কিন্তু গ্রামের প্রধান যিনি, সেই বসুভূতি দত্ত বলেন, ভাল কাজ করল যদুপতিরা। বর্ধমান, সপ্তগ্রাম, সম্পন্ন জায়গা সব। বাদশাহী সড়কের উপর বর্ধমান। নিয়ত লোক চলাচল। বাজার হাট বেচাকেনা, সাহস করে না বেরোলে হবে কেন? আমি বলছি ভাল হবে।

কিন্তু সবাই গণপতির মাকে ছি ছি করেছিল। তিনি গ্রামের শিবমন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতেন। দেবতাকে বলতেন, গণপতির স্নেহে আমি অন্ধ ঠাকুর! আমাকে ক্ষমা করো। গণার ঘরে সন্তান দাও, আমি দেখে নিয়ে নয় বেটাদের ঠেঙে যাব।

ঘাটে যেতে পারতেন না, সবাই ছেঁকে ধরত কথার জালে।

—কেমন করে পারলি দিদি, আমি তো আমার বেটাদের চক্ষে হারাই।

কেউ বলত, কতদূরে বা গেল, ধরো যদি দেখা না হয়?

অসহ্য হলে গণার মা বলতেন, আ লো! তোর শাউড়ি মরল যখন, কোন বেটা ছামুতে ছিল? দেখা হয়েছিল?

—তিনি তো গেল সপ্যদংশনে।

—দেখা তো হ'ল না।

করঞ্জাক্ষ বেনের মা বললেন, যা বলো তা বলো গণার মা! কাজটা ভাল করনি।

—তবে শুনবে? হেথা থাকলে যদু আর ছিরির ফাঁড়া ছিল।

—সে কি ? আমরা জানি নি ?

—মুকুন্দ ঠাকুরের জ্ঞাত কাকা, আচার্যির তৈরি ঠিকুজী। তোমরা কি পড়তে জান ?

—তা বাছা ! তুমি বা কোন্ বিদুষী ? সবাই কি মুকুন্দ ঠাকুরের মা ?

এ সব কেজে ঝগড়া চলেছিল বছর পাঁচেক। কিন্তু সময়ে দামিন্যার বেনে পাড়ায় সকলের মুখ ভোঁতা হয়ে যায়।

কেন না যদুপতি ও শ্রীপতি বর্ধমানেই বসত করে। কৌজে চাল বেচে ধনী হয়। তাদের জমিজমা, হাল বলদ, গরু, সবই হয়। মাটির দোতলা বাড়ি হয়। দুজনেই আবারও বিয়ে করে। যদুপতির বড় মেয়ের বিয়েতে মা গণপতিকে নিয়ে ঘুরে আসেন। দেখে শুনে বলেন, দামিন্যায় থাকলে এসব কি হত বাছারা ?

—তাই কি হত মা ?

—ঘরে যেয়ে ঠাকুরকে সোনার বেলপাতা দিয়ে পুজো দেব।

—কিন্তু মা ! গণার তো ছেলে হ'ল না।

—কি জানব বাছা। হাতে রয়েছে পাঁচ বেটা তিন বেটি হবে।....

—ওরে আবার বিয়ে দাও।

—দেখি !

গণপতির মার পুত্রভাগ্য দেখে পড়শিদের মুখে প্রশংসা, মনে হিংসা ছিল বটে। কিন্তু গণার বউ যে বাঁজী, সে কথা বলতে বাধা নেই।

সবাই বলত।

গণার মা অবধি বলতেন।

—বাঁজী, আঁটকুড়ি। আমার ঘরে আগুন দিতে এসেছিল গা !

শাশুড়ীর গাল, আর স্বামীর হাতে চড়-চাপড়, এ ছিল কনকার নিত্য পাওনা।

কনকা চেঁচিয়ে কাঁদত একেকদিন। সেদিন দামিন্যা কনকার কান্না শুনত।

আতাপিসি কনকাকে ঘাটে বসে বোঝাত, তুই বা চোপা করিস কেন শাউড়িকে। ছেলের বে' নাতির জন্যে। না বেটা, না বিটি, বুড়ীর মন পোড়ে না?

—ওরে আমার তুমি রে! কত বছর ধরে অসাগর খাটছি বলো তো? সংসারটা সাজিয়ে রেখেছে কে?

—খাটবি না বা কেন? তোর ঘর, না পরের ঘর?

—সতীন সইতে পারব না।

—গণারে তুই অষুদ করে থাকবি। সে বা বে' করে না কেন?

—করে দেখুক!

—ছেলে পিলে না হলে গণার মন টেঁকবে কেন ঘরে? নয় তুই সোন্দরী আছিস। এতকাল ধরে দেখছে, তোর ওপর সে টান থাকতে পারে? হ্যাঁ, হত একটা দুটো, ঘরে মন বসত।

—আমি কি ঘটি বাটি, না গাছ? যা বলছ তা বুঝি। মন মানে না।

—মনকে মানাতে চেষ্টা কর। শাউড়ি তো হাপসে মরছে।

—আনলে আনবে তো একটা দশ বছুরে খুকি! চার-পাঁচ বছর না গেলে সে মা হবে?

—জানি না বাছা। তবে এটা জানি গণার ছেলেমেয়ে না হলে গাঁ থেকে নাম উঠে যাবে তোদের। যদু বলো, ছিরি বলো, তাদের বয়ে গেছে হেথা আসতে।

—দেখ! ভূষনোর মনসার থানে ঢিল বেঁধেছি, ক'মাস দেখতে দাও!

—দেখ!

আতাপিসি এ কথা গণার মাকে বলতে গিয়ে বিপাকে পড়ল। তিনি বললেন, সম্বাদ করতে বলেছি ছেলেদেরে। বাঁজীর সন্তান হবে মনে করো? দেবতা—দৈবী-মান্নত-মান্‌সা কম করেছে না কি

বাঁজী। সকলে ফল পায়, ও পায় না।

—কি জানি কেন!

—আমার চোখের ওপরেই নেচে বেড়াচ্ছে দেখ। সাতকুলে কেউ নেই যার ···

—দেখ! কি হয়!

—গণা বা কেন উজ্যোগ করে না?

উদ্যোগ ব্যাপারটা গণপতির স্বভাবেই নেই। এখন জমিজমা দেখে, ভূতগত খাটে, খায় আর ঘুমোয়। বিয়ে একটা করা দরকার তা বোঝে। কিন্তু তেমন কোন উৎসাহ পায় না।

সমবয়সীদের বলে, সতীন আনলেই ঝগড়াবিবাদ করবে, অশান্তি হবে।

—ঝগড়া করলে ভয় দেখাবি, বাপের বাড়ি পাঠাব, বাস, শুধরে যাবে।

—কনকার বাপের বাড়ি আছে?

—থাকলে না জানি কি হত। না থাকতেই এত মেজাজ। তোকে ও বশ করেছে।

গণপতি মৃদু হাসে। বশ নয়, অভ্যাস, অভ্যস্ত আরামের আশ্বাস। কাচা কাপড়টি, গায়ের চাদরটি, পরিষ্কার বিছানাটি, বড় আরামের। পাঁচ-সাত ব্যঞ্জনে রান্না খেতে বড় ভাল। আর রাতে পা টিপে দেয় কনকা, বড় আরামের।

—তোর মায়ের কথাটা তো ভাববি?

—ভূষনোতে ঢেলা বেঁধে এসেছে দেখি····।

সে ঢেলা বেঁধে কার কি মনোবাসনা পুরল কে জানে। তবে কনকার কোলে সন্তান আসে নি।

গণপতির মা, বলা যায়, সেই হুতাশেই মরে গেলেন একদিন। ভুগেছিলেন, শয্যাশায়ীও হয়ে পড়েছিলেন অনেক দিন।

মরে যাবার আগে বললেন, তুই বে' করলি না, তোর ছেলে দেখে গেলাম না, পরলোকেও আমার হুতাশ যাবে না।

যদুপতি, শ্রীপতি, বেনেসমাজের সবাই গণপতিকে ছি ছি করল।

আর বেনে গিন্নিরা বললেন, দোষ তো কনকার। জানছিস তুই বাঁজী। জানছিস গণা বে' না করলে, বেটার বাপ না হলে দামিন্যায় গণাদের নাম মুছে যাবে, তবু উজ্যোগ করে সতীন আনলি না?

একজন খোঁচা দিয়ে বলল, কাপড় দেখ, ধপধপে। ঘর দেখ, ঝকঝকে। শুচিবেয়ে মেয়েছেলে গো! কচিকাঁচা ও সইতে পারবে কেন?

কনকার বুকে শেল বিঁধে গেল।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকেবুকে গেলে ও বলল, দেখ! কালাশৌচের একটা বছর যাক। তারপর তোমাকে বে' করতে হবে।

—চুপ কর দেখি। এখন দশটা বে' করলেও মা তো দেখতে আসবে না। মা থাকতে বলতে পারিস নি?

—তুমি বা বে' করলে না কেন?

—"বে'" শব্দ মুখে আনতেই মাথা কুটতে, রোলারুলি কাঁদতে, অশান্তি করতে, না কি ভুলে গেছ সব?

কনকার বুকের ভেতরটা শূন্য হয়ে গেল। কেন অমন করত, তা গণপতি বোঝে না? হ্যাঁ সতীন ঘরে ঘরে দেখা যায়।

কিন্তু কনকা যে বহুদিন একা ঘরে একেশ্বরী হয়ে আছে? গণপতি যে তার একার। নিঃসন্তান মেয়েছেলে স্বামীকে আঁকড়ে ধরে না?

না কি অমন ভালবাসায় অরুচি ধরে গেছে স্বামীর?

গণপতি বলল, আমার বিছানা মায়ের ঘরে করে দিও।

—হেথা শোবে না? নয় মাঝে লোহা রেখে শুতে?

—এক বছর তো নয়। মা আমার জন্যে দাদাদের ছাড়ল, তার তরে কিছু তো করব?

—বেশ! তাই হবে।

—ঘরে আর মন বসছে না। সব যেমন ফাঁকা, হা হা করছে।

কালাশৌচের কালে ঘরে রাত্রিবাস করতে হয়, করব। কিন্তু দাদাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমি····

—কি করবে ?

—ওরা যা করে ? এ হাটে কিনব ও হাটে বেচব।

—শরীরে কুলোবে ?

—খুব কুলোবে, কুলোতে হবে। মনটা তো ভালো থাকবে। হেথা সেথা ঘুরব, পাঁচটা মানুষের সঙ্গে আলাপ হবে····ঘরে থাকতে হলে পাগল হয়ে যাব।

—যা বলবে, তাই হবে। তবে আমারও কথা আছে।

—যা, বাঁশবনকে বল্‌গে যা।

—এত ঘেন্না আমার 'পরে ?

—ক'দিন ক্ষ্যামা দে কনকা। তোর ছায়া দেখলেও মন পিতিয়ে উঠছে। মা থাকতে মায়ের মর্যাদা করি নি, সে তো তোর জন্যেই।

দামিন্যার বেনে সমাজ বড় আনন্দে দেখছিল, কনকার থোঁতা মুখটি ভোঁতা হয়েছে। গলা শোনা যায় না আর। স্বামী নিয়ে আদেখলাপনাও ঘুচেছে।

বেনেপাড়ার সরস্বতী কনকার সই। সরস্বতী বলল, যা চেয়েছিলি তাই পেলি। শাউড়ি নেই, সয়া আর তুই।

কনকা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, আঁচলে গেরো দিয়েই কি বেঁধে রাখতে পারলাম সই ?

—কেন, কি হল ?

—এখন আমি তার চোখের বিষ।

—দেখ! ভেবে দেখ! সয়া নিহাত ভালমানুষ বটে। অন্য বেটাছেলে হলে বে' করত, এতদিনে সন্তান হত।

—সে হত সুয়ো, আমি হতাম দুয়ো।

সরস্বতী আর লক্ষ্মী দুই সতীন। সরস্বতী চিরকাল "কনকা" বলে গলে পড়ে, লক্ষ্মী তেমন করে না। আজ সরস্বতীই ঘটি মাজতে-মাজতে নিচু গলায় বলল, তেমনই হবার কথা। সেই ভয়েই তুই

মরিস। তা দেখ্ সই তুই একলাই রইলি। সয়া একটা বছর কাছাকাছি কেনাবেচা করল। তারপর সে দূরে যাবে।

—ঘর ফেলে?

—ঘরের টান হয়, ঘরের মানুষজন নিয়ে। ওর আছে কে? তুই, আতাপিসি, আর তোর তকতকে ঘর, ঝকঝকে বাসন, নিকানো উঠান! হবে না কেন? ছেলেপিলে থাকলে ঘরের উঠানে খেলে, এটাসেটা টানে, মাকে ব্যতিব্যস্ত করে। সয়া ঘরে থাকবে কোন সুখে?

—চলে যাবে? হ্যাঁ সই?

—বেটাছেলে, মন উঠলে যেতেও পারে, নতুন সংসার পাততেও পারে।

—মা কত বলত····

—সেই খুব জ্বালাপোড়া পেয়ে গেছে। সেও তো তোর কারণেই!

—সই!

—ফোঁস করবি তো? কর্ না। ওইটুকুই তো ক্ষ্যামতা তোমার।

কনকা বুঝল, সইও তার ওপর থেকে মন তুলে নিচ্ছে।

কনকা বলল, তোরা যেমন ভাবিস, আমি তেমন নই।

—থাক সই, আজ রাঁধার পালা আমার। অনেক কাজ হেঁসেলে।

—না, শুনে যা! কালাশৌচ কাটতে না কাটতে ঘরে সতীন না এনেছি তো আমি কনকা নই। আমার উঠোনেই ছেলেমেয়ে খেলাবে, কাঁথা শুকাবে। সংসার ঝলমল করবে।

—দেখিস, মনে রাখিস!

সরস্বতী চলে গেল।

কনকা মনে মনে বলল, আমার কথা রেখো ঠাকুর! শুধু বর্ধমানে কেন, দামিন্যাতেও যেন আমার শ্বশুরের বংশ থাকে। আমাকে বা কেন বাঁজা রাখলে, কি তোমার ইচ্ছা তা তো জানি না। কিন্তু

পাপী করে রেখো না আমাকে। আমি স্বামীর বিয়ে দেওয়াব।

কালাশৌচ কালে আতাপিসি কনকার ঘরে শোয়।

যতদিন গিন্নি বেঁচেছিলেন, তাঁর ঘরে শুয়েছে।

আজ আতাপিসি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বলল, বউ। এ কি শুনছি?

—কি শুনলে?

—সরস্বতী বলছিল তুই সতীন আনবি? বড় আনন্দ হ'ল মা! এই তো বড় বংশের মেয়ের মত কথা!

—সরস্বতী বলল কখন?

—সে তো ডেকে ডেকে বলছে গো! বলছে, আমার সইকে তোমরা চেনো নি এতকাল! আমিও বললাম, গণার বে' হয়নি সে কি বউয়ের দোষে? বে' সময় হলে আপনি হবে।

—বাপ রে বাপ! এমন করছ তোমরা....

—তা বাছা, সংসার মানে সন্তান!

—বুঝেছি। এখন ঘুমোও দেখি।

—যাক! এতদিনে...মানে গণার বে' হলে বাড়িটা সেজে উঠবে।

—বটে! আর কার বাড়ি এমন চোখজুড়োনো, বলতে পার?

—সন্তানই সব বউ! সেই যে রাজকন্যে বাঁজী ছিল বে' হতেও? বাপ বলেছিল, মুখ কেন আঁধার মা গো? যা চাইবে তাই দেব।

—আর রাজকন্যা বলেছিল, ধুলো আঁচল দিতে তো পারবে না বাবা! ছেলেপিলে ধুলো খেলে মায়ের কোলে ঝাঁপালে ধুলো আঁচল হয়।

—এই তো জানিস!

—সবাই জানে। আস্পদ্দা তো তোমার কম নয় পিসি? এ গল্প আবারও বলো?

—ও বাবা! গায়ে যে ফোসকা পড়ল! তোর ওই প'ক্ষের

ঝ'ঙ্কের, শুচিবাই, এ জন্যেই তুই বাঁজা হয়ে রইলি বউ!

—বাঁজা আছি তো আছি! কার তাতে কি? মা আস্পর্দ্দা বড্ড বাড়িয়ে দিয়ে গেছে তোমার। কাল হতে তুমি অন্যত্তর শুয়ো পিসি। এ ঘরে থাকতে হবে না।

রেগেমেগে আতাপিসি সেই রাতেই মাদুর নিয়ে দাওয়ায় গিয়ে শু'ল।

আর সকাল না হতে গণপতিকে বলল, ভাঁড়ারের কোলে এট্টা ঘর তুলে দিস তো গণা?

—কেন, কি হ'ল?

—এমনি রে, এমনি।

—বিষমুখী কিছু বলেছে?

—না রে না। সে আমার মেয়ের সমান। বড্ড মান্য করে।

পিসির জন্যে নতুন ঘর হল, নতুন চৌকি, উঁচু দাওয়া। কনকা বলল, এ কি হচ্ছে, পয়সা নষ্ট?

—তোমার বাপের পয়সা নয় বউ। আর পিসি মা'র জন্যে যা করেছে....

—বেশ!

গণপতি বেরিয়ে যেতে কনকা এক পত্তন চেঁচামেচি করল বটে, সে তো করেই। আতাপিসি কিন্তু খুব খুশি হল।

নিজের ঘর একট্য! কাঁথামাদুর টানতে হয় না। দিব্যি উঁচু দাওয়া, পা ঝুলিয়ে বসা যায়। কুলুঙ্গিতে রাখা যায় কাঁকই, তেল, দাঁতের মিশি।

জীবনে প্রথম একটা নিজের জায়গা হ'ল। আহা! গণার ছেলেমেয়ে থাকত, তো কত কথা বলতে পারত তাদের আতাপিসি। ছড়া বলো, শোলক বলো, কম জানে সে?

যদুপতি আর শ্রীপতির বউয়ের ছেলেমেয়ে তো আতাপিসির কাছে বসে গল্প শুনতে কত ভালবাসত।

ছেলেমেয়ে না থাকলে বাড়ি কি সাজে? যাক, এতদিনে কনকার

সম্মতি হয়েছে !

কনকা বলল, পিসি কি ঘরে মোটে ঢোকো নি ? বিছানা মাদুর সব রোদে দিতে ভুলে গেছ ?

আতাপিসি গণপতিকে শুনিয়ে বলল, ও ঘরে শুইনা, দাওয়াতেও উঠিনা। ভাঁড়ার রে, দুধ রে, কুটনো কাটনা রে! সময় কোথা পাই বাছা ? উঠোনে একটা পাতা পড়লে তুমি আমাকে চিবিয়ে খাবে না ?

—আমি কি বসে থাকি ?

—তোর বয়স আর আমার বয়স ? দেখ, দু'জনায় খাটতে পারি কেন জানিস ? ছেলেপিলে হয় নি ব'লে।

কনকা বলল, তেঁতুল কোটো তো ? অনেক কমে গেছে।

—তুই যাস কোথা ?

—ঘটকালি করতে।

কনকা মল ঝামরে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

কনকা এ বাড়ি-ও বাড়ি যাচ্ছিল। দেখে শুনে সতীন আনবে, যে তার অনুগত থাকবে।

কনকা যে তার বিয়ের জন্যে উদ্ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, এ কথা গণপতি বেনে সমাজে পাঁচজনের মুখে শুনছে এখন। সবাই বলছে, তোমার বউকে ভাল বলতে হবে।

গণপতি এতেই খুশি। কনকাকে বলল, তুমি দেখছ, তুমিই দেখ। ছোট মেয়েকে মানুষ করবে, কাজ শেখাবে, সে তো তুমি।

—ছেলে হোক, মেয়ে হোক, মানুষ করব আমি।

—তাই কোর। পরলোক থেকে মা দেখবে আর আশীর্বাদ করবে।

—মায়ের বাৎসরিকটা হয়ে যাক।

গণপতির মায়ের বাৎসরিক কাজ বেশ জাঁকিয়ে হল। বর্ধমান থেকে দাদারা এল. বাড়ি গমগম করতে থাকল।

কনকাকে এমন নরম-সরম, এমন মৃদুকণ্ঠ কেউ দেখেনি।

যদুপতির বড়বউ আতাপিসিকে আড়ালে শুধাল, ব্যাপার কি গো পিসি? ধানীলঙ্কা থেকে আঝাল্লা লঙ্কা হয়ে গেছে যে?

আতাপিসি পরম সন্তোষে বলল. পাপের ভয় নেই একটা? গণা বে' না করলে দামিন্যায় বংশের নাম লোপ পাবে, সেটা মাথায় ঢুকেছে। এখন নিজেই সতীনের খোঁজ করছে।

—সে কি গো?

—ওকে চেনো না? তেমন মেয়ে আনবে, যে ওর বশে থাকবে।

—মেয়ের খোঁজ কি আমরা দিতে পারি না? কিন্তু ওর সতীন হলে তো সে মেয়ে জ্বলে মরবে।

—দরকার কি তোদের? তোরা কোন্ দূরে থাকবি, দেখতে পারবিনা। ও যা মনে করে করুক গে'।

দাদারাও গণপতিকে বলল, বিয়ে তোর অনেক আগে করা উচিত ছিল। বাঁজী বউ, তার ভয়ে তুই....।

—এবারে করব।

—কাজে বেরোচ্ছিস, বেনে সমাজেই যাচ্ছিস। যোগাযোগ হয়েই যাবে। আমরাও দেখছি। তবে তোর বউ যা দজ্জাল।

—তোমরাই তো দেখবে দাদা। মা নেই, তো আমার মাথার ওপর ছাতা নেই।

—মা তোর জন্যেই এখানে পড়ে থাকল। যখন বিদেশে গেলাম, মনে বড় দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু মা ছিল মহাজ্ঞানী।

—দামিন্যা ছেড়ে গেলে বলে দাদা! তোমাদের পথ খুলে গেল। নগরে সুবিধা কত!

—ফৌজ আছে. ছাউনি আছে, কাছারি আছে, তারা কেনে, খায় বাদশাহী সড়ক আছে। গো-শকটে পণ্য চালান যায়।

—দামিন্যাতে বসেও আমি বুঝছি, এখন মাটি কামড়ে থাকলে চলবে না। মা থাকতে বেরোতে পারি নি। মা জ্ঞানচৈতন্যহারা হয়েছিল। তিলেক না দেখলেই কোথা গেল, বলত।

—আর কি বলত?

—প্রলাপ বকত আর কি! ওদের যেতে বলেছি, তোরে যেতে বলি নি! অনেক, অনেক দুঃখ পাবি তুই। তোরে লয়ে আমি থাকব⋯সব প্রলাপ! তবে নাতিনাতনিদের খুঁজত। শ্রীনন্দ যায় নি! সাবিত্রী দেখ, কান বিঁধাবে না, কাঁদছে—মেজবউ ওদেরে আম মুড়কি দিলনা⋯খুব খুঁজত।

—ছেলেমেয়ে নেই, মায়ের কথা মন জুড়ে থাকে। বিয়ে কর, সন্তান হোক, ক্রমে ক্রমে ভুলে যাবি।

—তোমরা আশীর্বাদ করো।

—ত্রিনয়নীতে যাস গণা। চৈত্রমাসে বুড়োশিবের মেলায় বিস্তর কেনাবেচা। ভূমিবান মানুষেরা পুণ্যাহ করে, নতুন বাসন—কাপড় কেনে—সেথা বেনেরা ইট পুড়িয়ে দালান দিয়েছে শুনি।

—তোমরা দাও নি?

—ইটের ঘরে কোন্ সুখটা আছে? মাট্যাঘর, খড়ের ছামুনি, শীতে গরম, গ্রীষ্মে ঠান্ডা। মায়ের নামে পুকুর পিতিষ্ঠে করব জ্যৈষ্ঠে। শুধু পানীয় জল নিবে মানুষ। উঁচু করে আড়ি বাঁধব। পুকুরে বাসন উৎসর্গ করব। পিতিষ্ঠে কালে আসিস।

—বলেছ ভালো। এখানেও—

—আমার পিতামহের দীঘি থেকেই সবাই জল নেয় এখনো। জল যদি বলিস, দামিন্যার জলের মত জল নয় সেথা।

দাদারা যখন চলে গেল, গণপতির বড় একলা লাগল।

কনকা বলল, আবার তো আসবেন। তোমার বিয়েতে সবারে আনব।

—বিয়ে ঠিক হোক।

—নিশ্চয় হবে। আমার মন বলছে হবে। লোকে বলে আমি

কেন দেখছি। আমি তারে নিয়ে ঘর করব, আমি দেখব না?

—তাই দেখ। আঁটকুড়া বলে ভিখারি বোষ্টম সকালে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, এ অপমান আর সয়না।

কনকা স্বপ্নেও ভাবেনি যে গণপতি, তার হাবা গোবা স্বামী, নিজের বিয়ে নিজে ঠিক করে আসবে।

অথচ তাই হ'ল।

কেমন করে হ'ল, সে এক রূপকথা বটে।

গণপতি বেনে। সে সপ্তগ্রাম, ফুলিয়া, শান্তিপুর থেকে কাপড় আনে, হাটে হাটে বেচে। কোথায় ভাগীরথী নদী বয়, কোন বা খাগড়া থেকে নৌকা করে কাঁসার বাসন আনে ব্যাপারীরা, গণপতির খুব সাধ, সে পুঁজি পেলে বাসন বেচবে। উৎকৃষ্ট কাঁসা, পিতল, তামার বাসনে লাভ খুব।

তা, কাপড় বেচতেই গিয়েছিল সে ত্রিনয়নীর বিখ্যাত বুড়োশিবের মেলায়। যথেষ্ট কেনাবেচা হচ্ছিল, একসঙ্গে এত লাভ সে অনেকদিন করেনি। কনকা কেমন করে জানবে সেই মেলাতেই আসবে তার মামা শচীপতি? আর জামাইকে আদর করে নিয়ে যাবে তার বাড়ি?

এই মামা, মায়ের খুড়তুত ভাই, সে যে ত্রিনয়নীতেই থাকে, লঙ্কা-হলুদ-জিরে-মরিচ-কর্পূরের ভাল ব্যবসা করে, তা কনকা জানত না।

মেয়েছেলে বিয়ের পর হাঁড়িহেঁসেলে ঢুকে যায়, পিত্রালয়েই বা যায় কোথায়? কোন ছোটবেলা বিয়ে, দশ বারো বছরে পিত্রালয়ের ঘরদোরের ছবিটাও স্বপ্নের মত ঝাপসা হয়ে যায়। এই মামার খবর কনকা রাখতই না।

মামা তো ভাগ্নীজামাইকে পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়েছিল। খাইয়ে, মাখিয়ে, নতুন ধুতিচাদর, কনকার শাড়ি দিয়ে গণপতিকে বশ করে ফেলল। তার পরেই পেড়ে বসল অহনার কথা।

বারো বছর হয়ে গেল, বিয়ে দিতে পারেনি, সে তো গণকঠাকুর বারণ করেছিল বলে। যে সে গণক নয়, রামাচার্য জ্যোতিষশাস্ত্রী। একমুঠো টাকা দিয়ে তবে দর্শন মেলে। তাঁর নিষেধের জন্যই তো—নইলে রজঃস্বলা মেয়ে কে ঘরে রাখে? মেয়ের মত মেয়ে। মারো, ধরো, মুখে শব্দ নেই। এই বয়সেই সে নিমেষে সপ্তব্যঞ্জন রেঁধে অতিথবিতিথ কুটুমবন্ধুকে খাইয়ে দেয়।

শচীপতির সোনার পুতলীটি কে নেবে, এই চিন্তায় শচীপতি পোড়ে। আইবুড়ো মেয়ের বাপ হবার জ্বালা, আবার আদুরে মেয়েটি কোন ঘরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে সে চিন্তাও মনকে পোড়ায়।

ত্রিনয়নীর বেনেরা জানে বটে কথার জাল বিছিয়ে মানুষ ধরতে। গণপতি অত কথাবার্তার ছলচাতুরি বোঝে না। সে স্বভাবে গোঁয়ার, দম দিয়ে খাটতে পারে। রাক্ষসের মত খেতে পারে। বিরক্তির কারণ হলে বউকে গাল দিতে ও মারতে পারে।

আর কিছু পারে না।

কি গণেশ পুজো, কি ধ্বজাপুজো, পুজোর কথা সে শোনে না বসে কখনো। সর্বদাই সে নিজেকে বিপন্ন মনে করে, নির্বান্ধব।

—সকলের অবস্থা ফেরে, আমার কেন ফেরে না?

—বিশ্বাস করে ভোটকম্বল আর কম্বলের আসন কিনলাম, আমাকেই ঠকাল?

—জ্যোতিষী বলেছিল পাঁচ বেটার বাপ হব। আমার কপালেই বাঁজা বউ?

গণপতি তেমন মানুষকেই সইতে পারে, আপনজন মনে করে, যে গণপতিকে কথায় কথায় "আহা" বলে থাকে।

কনকার মামা কি কম মানুষ?

সে জামাইয়ের মুখে যা শোনে তাতেই "আহা", "আহা" বলে গণপতির মন নরম ক.র ফেলল। আর কনকার মামা ক্রেতাদের নিয়ে আসতে থাকল গণপতির দোকানে। তার বিক্রিবাটাও হল ভাল।

এ সব কথাই কনকা পরে গণপতির চাকর গদাধর বা গদাইয়ের

কাছে শুনেছে। দোকানের ঝাঁপ ফেলে কাপড়চোপড় বেঁধেছেঁদে নিজের বাড়ি নিয়ে তুলেছেন শচীপতি। গদাইও ওখানেই থেকেছে, খেয়েছে। কিন্তু যত গল্প তো মনিবের সঙ্গে।

—মনিবকে জল গামছা দিত কে?

—বাড়ির বিটি অহনা।

—খেতে দিত কে?

—গিন্নি রাঁধেবাড়ে, বিটি ভাতের থালা আনে।

—খাওয়ার পর পান মশলা?

—বিটি দেয়।

—ঘর দুয়ার কেমন?

—ইঁটের বাড়ি গো মনিব্যান। কাঁঠাল কাঠের দরজা, ঘরে ঘরে খাট, চৌকি, ভাল বিছানা, কড়ির আলনা, আর বাসন চারটি আছে বটে। খাটের নিচে ঠিলে দেয়া বাসন। গিন্নির গায়ে যত গয়না, বিটির গায়েও তত।

—মেয়েটা দেখতে....কেমন?

—চাঁদের মত মুখ। সকাল না হতে আমাকে এক ধামা চিড়ে, কলা, ক্ষীরখণ্ড দিত। আর তোমার কথা যা শুধাত!

—কি বলত?

—তুমি দেখতে কেমন, কি করো, কেমন সংসার করো....বলে, বাবা নিয়ে যায় তো একবার যেয়ে, দেখে আসি। জীবনে কোথাও গেলাম না, কোন আপনার জনকে দেখলাম না। আমার তো পিসাতো বোনই হল। না কি বল?

—সে শুধায়, তার বাপ মা?

—সবাই শুধায়, সবাই। ত্রিনয়নীর মেলাতে আস যাও, তুমিই যে গণপতি তা জানব কেমন করে? শুনেছি দামিন্যার সম্পত্তি বেচে তোমরা কোথায় কোথায় চলে গেছ। তোমার মামী বলে, কনকা তো ছিল কনক পুতুলী। সভাউজ্জ্বল মেয়ে!

কনকার বাপের বাড়ি থেকেও নেই। স্বমাতা পরলোকে।

বিমাতার হাতে সংসার। কনকা, সনকা, বল্লিকা, তিন বোনকে বিয়ে দিয়ে বাবা দু'তিন বছর তত্ত্বতাবাস করেছিল, তা বাদে সব ভুলে গেছে।

তার জায়েদের বাপ-ভাই আসত। শাশুড়ি কনকাকে ঠেস মেরে বলতেন, বাঁজীর বাপ-ভাই থেকেও নেই। ক'দিন নিয়ে যেত তো বুক জুড়াত। কি জগদ্দল পাথর আমার বুকে চাপিয়ে দিল গো! মনে কি ছিল কে জানে?

তাই মামা মামী তার কথা বলেছে শুনেই কনকার বড় ভাল লাগে। আছে, তার খোঁজ নিতে কেউ আছে। সে বলে, হলে বা মায়ের খুড়াতো ভাই। মামা তো বটে! বিয়ের কালে আসতে পারেনি। গরদের কাপড়, তসরের ধুতি পাঠিয়ে যৌতুক করেছিল। তা, তোমারেও যত্নআত্তি করেছে?

—খুব। পুকুর আছে, জাল ফেলাত। জামাইকে প্রত্যহ মাছের মুড়ো, পিঠাপায়েস খাইয়েছে।

কিন্তু এ আদরযত্ন তো নিঃস্বার্থ নয়। ক'দিনেই মামা গণপতিকে বুঝিয়ে ছাড়ল, অহনার জন্যে যেমনটি খুঁজছে, গণপতি ঠিক তেমনটি বর। সতীন আছে তাতে কী? কনকার একার ঘাড়ে সংসার, দু'-বোনে কাজ করবে। গণপতি তো বেটাছেলে। কাজের জন্য হেথা-হোথা যায়।

তখন দুটিতে থাকবে। আহা, কনকা কবে থেকে সংসারের ভার টানছে। তার তো একটু আরামবিশ্রাম দরকার। অহনাকে দেখল গণপতি। মা খুব সুশিক্ষা দিয়েছে মেয়েকে। সম্বৎসর জয়মঙ্গলবার করে। ঘট পেতে মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করে নিখুঁত ভাবে। পুজো করে ওর মা, কিন্তু অহনাই তো জোগাড়জাগাড় দেয়। আর রান্না-বান্না? অহনা যেদিন তিনচারটি ব্যঞ্জন না রাঁধে, শচীপতির মুখে ভাত ওঠে না।

বছরের চারবার লক্ষীপুজো, শিবচতুর্দশী, সব করে অহনা। রূপ তো গণপতি দেখল স্বচক্ষে। এখন ভাবুক, গণপতি ভাবুক। বেটা-

বেটি হবে অহনার। আর, কনকা যে অপুত্রবতী, এও তো কনকার দোষ নয়। বিমাতা কোন অষুদবিষুদ করে থাকবে। কনকার বিমাতা নানা অষুদপালা জানে, এ কথা তো বেনেসমাজে সুবিদিত।

সব কিছুর পরে, গণপতি কাজকারবার করেই খাবে। শচীপতির ঘরসংসার তো দেখে গেল গণপতি। ত্রিনয়নী, বেতুল, নিশিন্দাপুর, তিনটি নগরসদৃশ গ্রামে শচীপতি ব্যবসা করে। তার প্রতিপত্তি যত, চেনাজানা তত। গণপতি যদি এ বিয়ে করে, তাহলে একজন মুরুব্বির মত মুরুব্বি পাবে। বাপ নেই, শবশুর হবে তার অভিভাবক!

—বিবাহ তো করতেই হবে তোমায়। না ছেলে, না মেয়ে, বংশধর তো চাই! করবেই যখন, অহনাকে নাও না কেন? শুনেছি তুমি কাঁসাপিতলের ব্যবসা করতে চাও। আমি তোমাকে ত্রিবেনী নিয়ে যাব। বাসনের নৌকা ধরে দেব, আমার বয়সে অত উদ্যোগ সম্ভব না। ছেলেও খুঁটি গেড়ে বসেছে এখানে। বলতে কি, তিনখানা গ্রামে কারবার করেই কুল পাই না! এক ছেলে থাকলে ব্যবসা হয় না। কি চাষবাস, কি ব্যবসা, লোকবলেই বল! থাকত চার বেটা····

—সত্যি কথা।

—তা, জামাই-বেটায় তফাত কি, বল? অ্যাঁ?

এমন নানা কথায় গণপতি ভজে যায়। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে স্থির জলে নিজের চেহারা দেখে। বেশ মাঝারি, বলিষ্ঠ চেহারা। রং শ্যামলা, সুপুষ্ট গোঁফ আছে। ঠোঁট মোটা, নাকের পাটা চওড়া, চোখ দুটি বড় ছোট।

চোখ অনুজ্জ্বলও বটে। কিন্তু গণপতির নিজেকে খুব সুপুরুষ মনে হয়। বেটাছেলেকে তো চেহারা পরীক্ষা দিতে হয় না। রং, চুল, চোখ, মুখ, হাতের আঙুল, পায়ের পাতা, মেয়েরা পরীক্ষা দেয়। যে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারে সে।

বিয়ে করো, বউ আনো, এ কথা কনকাই বলে তাকে। অহনাকে যেটুকু দেখেছে, গণপতি খুবই মোহিত। ধীরে বলে, ধীরে চলে, পিঠঝাঁপা চুল। চোখ দুটি যেন সর্বদা সচকিত, বিস্ময়ে বড় বড়।

স্বাস্থ্যশরীরও বেশ।

ছিল, কনকাও বেশ ছিল। এখনো আছে। কিন্তু পুরনো হয়ে গেছে তো! শিশুহীন নিরানন্দ বাড়ি। অহনা মল ঝমঝমিয়ে বেড়াবে। হাসবে, কথা বলবে। বাড়িটা একটু আনন্দময় হবে।

গণপতি একরকম "হ্যাঁ" বলেই এল। গদাইয়ের সঙ্গে তার মনের কথা চলে। বলল, মামার মেয়েটি বেশ।

—হ্যাঁ, লক্ষ্মীমন্ত বটে।

—আমাকেও দেখ্, বিয়ে করতেই হবে।

—সে তো হবেই।

—তোর মনিব্যানই বলে, বউ আনো।

—নয়তো কি! সর্বদা বলে।

—ছেলেপিলে না থাকলে···

—বাড়ি যেমন, অন্ধকার!

—এ তো মনিব্যানের বোনই হল।

—মনিব কত্তা! ওরকম মেয়েছেলে বলে। আবার সতীন আনলে কেচাকেচি করে।

—তোর মুখে এই কথা?

—আমাদের ঘরে কত্তা! দুটো বউ লাগেই। একটা রাঁধে বাড়ে, অন্যটা ছেলেপিলে, গাই গরু সামলায়। আমি তোমার এখানে খাই। কিন্তু জমি আছে, চাষ আছে। সংসারও বিস্তর বড়। চার ভাই, ছয় বউ, সতেরটা ছেলেমেয়ে।

—ঝগড়া হয় না?

—খুব হয়। মা আছে না? সকলেরে পিটায়, কাজ ভাগ করে দেয়, সেই তো দেখে।

—তুই আর লাঙল ঠেলতে পারবি না।

—আর পারি? সে ভাইরা দেখে। এ ক'দিন খুব খেলাম। বল? বড় বড় মাছ গো!

—খাওয়াটাই দেখলি!

—না, ব্যাভার, কথা, সবই ভাল। মানীগুনী লোকও বটে। বাজারে মানসম্মান কত!

—ঘরে যেয়ে একবার মুকুন্দ ঠাকুরকে দিয়ে কোষ্ঠীটা দেখিয়ে নেব।

—আমরা ওনার কাছে যাই না।

—তেগুনা আছে তোদের! তোদের জ্যান্ত ঠাকুর।

—ও বাবা! বিস্তর জানে! মাটিতে সিঁদুরগোলা লেপে এমন গনে দেবে····

—জাতে হাড়ি।

—ওর গুণ সবাই মানে। আমার মেয়েটা রাতোদিনে চমকে উঠত, আর কাঁদত কি! অষুদভষ্ম করে তেগুনা মাদুলিতে পুরে দিল! সেই ধারণ করে মেয়ে সেরে গেল।

—তা হবে। হ্যাঁ গদাই, মনিব্যান মানবে তো?

—এই দেখ! বেটাছেলে, বউ আনবে, বাঁজা তো বটে মনিব্যান। তবে মানবে না কেন?

বাড়ি কাছে আসছিল, গণপতি কনকাকে মানাবার কথা ভাবছিল। এতটুকু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কেটেও যাচ্ছিল নিমেষে। সন্তান, সন্তান চাই। গণপতি ভিখারি-বাউল-বোষ্টমকে প্রথম ভিক্ষা দিতে চায়।

আটকুঁড়োর ঘর থেকে কোন ভিক্ষার্থী দিনের প্রথম ভিক্ষা নেয় না। পাড়াপড়শী প্রাতঃকৃত্যের জন্য মাঠে গেলে গণপতির দিকে পিছন ফিরে হাগতে বসে।

এ দুঃসহ সামাজিক অশ্রদ্ধা থেকে গণপতি বাঁচতে চায়। ব্যবসা-বাণিজ্য মন দিয়ে করবে কিসের আশায়? কে খাবে? সব কি ভ্রাতুষ্পুত্রদের ভোগে যাবে?

কনকাকে বুঝতেই হবে। সে বলেছে বলেই তো গণপতির বিয়ের আকাঙ্খা বেড়েছে।

॥ ৪ ॥

দামিন্যাতে অহনা-পর্বের সূচনা এভাবেই শুরু হয়।

গণপতি এবার সওদার মাল ফিরিয়ে আনে নি, সব বেচে এসেছে. তাতেই কনকা খুব খুশি। অপুত্রকের ঘর, স্বামীকে ঘিরে সংসার। এতদিন তো কনকা জেলেনীর কাছে ভাল মাছও কেনেনি।

মাছের ঝাল আর ঝোল, দুটো ব্যঞ্জন ছাড়া স্বামী ভাত খেতে পারে না। কোন প্রাণে কনকা ভাল মাছ কিনত? গদাইয়ের ছেলেকে ডেকে পুকুরে খ্যাপলা জাল ফেলে চুনোচাপটা মাছ ধরিয়েছে, অম্বল রেঁধেছে, দু'দিন ধরে তাই খেয়েছে। সধবা মানুষ, আঁশ মুখ করতে হয়।

আতাপিসি. সম্পর্কে পিসি. কর্মে দাসী বললে হয়। কিন্তু তার টেকটেকানি এ বিষয়ে খুব।

—একে তো পোড়ারমুখো ভগবান একটা ছেলে দিল না। কে জানে আগের জন্মে কি করে এসেছে বউ! তায় যদি গণেশের না-থাকা কালে মাছটুকু না খাও…খাবে নাই বা কেন? আমার দশা তো নয়।

ভগবানের অবিচার আতাপিসি সদাসর্বদা দেখতে পায়। ভগবান আছে, না নেই? যদি থাকেও, আতাপিসির সঙ্গে তার মহাশত্রুতা। নইলে এক বুড়োর হাতে কন্যা সমর্পণ করে বাপ ডুমুরপুর থেকে সংসার তুলে সকন্দ গ্রাম চলে যায়?

বলে যায়. ব্যবসা ব্যাপার তো হবে না। চাষবাসই করব তো অন্যত্র যাই। এখানে করলে সবাই বলবে, দেখ! অমুকের ছেলে জাতকাজ ছেড়ে কি কাজ ধরেছে।

বুড়ো বলতে তেমন বুড়ো নয়। তবু আতাপিসি, যার নাম বিন্দুবাসিনী ছিল, সে তো তৃতীয়পক্ষ। চল্লিশ বছর বৈধব্যের পরেও আতাপিসি স্বামীর বিষয়ে ক্ষমাহীন।

—বিয়ে করেছিল তো সেবা করাবে বলে। এই তার হাঁটুতে বাত। গোবর নুনে ফোটাব, আকন্দ পাতা তুলে প্রলেপ দেব, গন্ধে বমি আসত, মা গো মা! আর নিয়ে গিয়েছিল ঝি খাটাতে।

কনকা ঈষৎ হেসে বলে, নিজের সংসারে খাটলে ঝি খাটা হয়?

—নিজের সংসার! হাঁড়িহেঁসেলের ভারই পেলাম না। রান্না হাতে না এলে কি সংসার করা হয়? দুই সতীন, এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা, শুধু মাছ কোটো বাছ! নয় শাশুড়িকে ঠাকুরসেবা করো। দাঁত নেই, আমি হামানদিস্তেয় মুড়ি গুঁড়িয়ে দেব, শিলে চালভাজা বেটে দেব, তাই খাবে। তারপর এই ডাল ভাজ, এই চিড়ে কোট, গতর-ভাঙা খাটনি। বেলা গড়িয়ে বড় সতীন ভাত দেবে, এতটুকু মাছের লেজা ভাঙা দিয়ে।

—খুব কষ্ট পেয়েছ।

—খুব।

—পিসেমশাই ভালবাসত না?

—তার জন্যেই তো রাগ হয়। যেদিন আমি ঘরে যাব, সেদিনই তার হয় বাত চাগায়, নয় অম্বল শূলের ব্যথা ওঠে…একটা ছেলে বা মেয়েও হয়নি।

—বিধবাও তো হলে।

—হলাম তো! দুবেলা শাশুড়ি বলে, যেথা খুশি সেথা যা! শেষে তোমার শ্বশুর যেয়ে নিয়ে এল।

—ভালবাসতেন তোমাকে?

—কিসের? মরা মানুষের নামে বলতে নেই, কিন্তু গোবরন্যাতা, বা উঠোন ঝাঁট, বা কলসি কলসি জল টানা, বা রাজ্যের থোড় মোচা কাটা, নয় কাঁথা সিলানো, অসাগর না খাটলে ভাত দেয়নি। ভগবান যদি একচোখো না হয়, একচোখো কে? দশমী একাদশী বুঝত না গা! মানুষ ছিল বটে বামুন মা, মুকুন্দর মা! দশমীতে বল, একাদশীতে বল, কলা পাঠাত, ঘটিতে দুধ। তিনি তো সবার খবর রাখত! যাকগে! এবার মরলে এক ঘরে একেশ্বরী হই, তেমন

কপাল নিয়ে যেন জন্মাই।

এসব কথা বলার কালে কনকা যেন কতই সমব্যথিনী। পরমুহূর্তেই কনকা হয়ে যায় অন্নদাত্রী মনিব্যান।

—আজ ভাঁড়ারটা গোছাও গো পিসি। মাসে একদিন না সারলে চলে না।

কনকা জানে আতাপিসি ওকে নিঃশব্দে গাল দেবে। আবার কাজটাও করবে।

ভাতটা, কাপড়টা, ভাঁড়ারের পাশে একটি একানে ঘর, চৌকি, বিছানা, এ তো কম কথা নয়?

দুধ, দই, ক্ষীর, বাতাসা, তিনটে তরকারি, খাওয়াও অঢেল।

আতাপিসি ছাড়া বাজার দোকান, গ্রামের গুজব চালাচালি, অনেক কাজই হত না।

গণপতি ঘরে আসতেই কনকা পিসিকে বলে, কাত্তিকদের পুকুরে জাল ফেলেছে পিসি, গদাইকে পাঠাও। আর, আজ হাটে যেও।

গদাই বোকার মত বলে বসে, যে মাছ খেয়ে এসেছে মনিব! এ গ্রামে অমন মাছ কোথা পাবে? যদি হাটে আসে!

—কোথায়, হ্যাঁ গদাই?

—কেন, ত্রিনয়নীতে।

গণপতি ধমকে বলল, বেটা জানে ভেড়ার মত ব্যা ব্যা ভ্যা ভ্যা করতে। এতদিন বাদে এলাম, ঘরে উঠলাম না⋯মাছের গল্প! যা, বলদগুলো খুলে দে গাড়ি হতে। ঘাস জল দে! ছইটা বাঁধবি আজকে।

কনকা আতিপাতি জল আনে, গামছা দেয়। বলে খানিক জিরোও আগে। কিছু খাবে?

—আনছে গদাই।

—কি?

—দেখ না।

সরু মোহনচিড়ে, ক্ষীরের হাঁড়ি, কর্পূর সুবাসিত ক্ষীরের ছাঁচ,

কলার কাঁদি. সব এনে এনে রাখে গদাই।

—নিজেও খাও, আমাকেও দাও। মনটা ভাত ভাত করছে।

—জিরোও, জল খাও, স্নান করো। নিমেষে রেঁধে দিচ্ছি।

—গদাই মাছ আনুক আগে ?

—কেন ! মাগুর জাওয়ানো আছে, বড় বড় কই মাছ। মাছ হলেই তো…অ বামীর মা ! গেলে কোথায় ?

পাটকরুনী বামীর মা বিরস গলায় বলে, কোথা আর যাব ? বাসন মাজছিলাম।

—রাখো, আমি জল দিয়ে নেব। মাছ ক'টা তাড়াতাড়ি কুটে দাও বাছা ! মনিবের ক্ষিদে লেগেছে।

একটি উনোন, তাতে পাঁচটি মুখ। আগুন জ্বললে একসঙ্গে পাঁচ ব্যঞ্জন রাঁধা যায়। বড় তাড়াতাড়ি আদা-হিং-বেগুন দিয়ে মাগুরের ঝোল, জিরে মৌরি বেটে কই মাছের তেল ঝোল, সুকতা, থোড় ঘণ্ট, শাকভাজা করে ফেলে কনকা।

এখন স্বামী কথা বলবে না। নাইবে, খাবে, পান গালে দিয়ে ঘুমোবে। বরাবর এক অভ্যেস। কনকার তো হেঁসেলে শিকল তুলতে দুপুর ঢলে যাবে।

আজ কিন্তু গণপতি জেগে বসেছিল। কনকা অবাক, ঘুমালে না ?

—বোস, কথা আছে।

কনকা মেঝেতে বসল। দিনেমানে স্বামীর পাশে কি বসা যায় ?

—কি এমন কথা ?

কনকার কোলে একটি শাড়ি রাখল গণপতি। বেশ চাঁপা রঙের খোল। মিহি লাল ডুরে, ঢালা লাল পাড়।

—হঠাৎ ?

—তোমার মামী দিয়েছে।

—আমার…মামী… ?

—তোমার মায়ের খুড়াত ভাই গো ! শচীপতি দত্ত। ওখানেই থাকেন…

—তাই ? কতকাল দেখি না····আপন মামাকেই দেখেছি কবে···· জানতামই না।

—খুব নামডাক, ওখানে, যাকে বলে বড় ব্যাপারী। ত্রিনয়নী তো গ্রাম নয়, নগর বললে হয়। দ্বাদশ শিব মন্দির, এত এত দীঘি, বাঁধা দোকানপাট, হাজার পাঁচেক লোকের বাস, বাদশাহী সড়কের পাশে গ্রাম। সেখানে নামডাক করা····

—সোজা কথা নয়।

—জাগ্রত ঠাকুর বটে কপিলেশ্বর শিব !

—সেখানে একবার গেলে হত না ?

গণপতি হেসে বলে, তোমাকে আর যেতে হবে না। ব্যবস্থা সব করে এসেছি।

কনকা তখনো বোঝে নি।

—কি ব্যবস্থা করে এলে ?

অনেক বছরের চেনা স্বামী, যেন কত সংকোচ জয় করে অপ্রতিভের মত হেসে বলল, তুমি নিজেও বল বিয়ে করতে, আর আমিও ভাবছিলাম, খেটে খেটে তোমার শরীরে কিছু নেই····তাতেই····আর বিয়ে করলে অজানা অচেনা কে বা····

"বিয়ে করো তুমি" কথাটি কনকা যখন বলেছিল, তখন জানেনি ঘটনাটা ঘটতে চলেছে, স্বামী নিজেই ঠিক করেছে সব, এতে তার মনে কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া হবে।

যেন জগৎসংসার ভেঙে খানখান, নিরালম্ব মহাশূন্যে কনকাকে কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

—বিয়ে····ঠিক করে এসেছ ?

গণপতি এই প্রশ্নটুকুর অপেক্ষায় ছিল।

—ঠিক মানে কি····দিনক্ষণ তো ঠিক হয়নি এখনো····তোমাকে না বলে তা ঠিক করবই বা কেন ?

—ওখানেই ?

—তোমার মামার মেয়ে গো, অহনা !

—মামাও দেখিনি, মামার মেয়েও দেখিনি, তা বয়স কত ?

—চৌদ্দ বলে শুনলাম।

—সে তো সা' যুবতী মেয়ে! এ বয়সে মেয়ে আইবুড়ো রাখে কোন বাপ ?

—মস্ত ফাঁড়া ছিল। জ্যোতিষের নিষেধ ছিল।

—কুলেশীলে কোন কলঙ্ক নেই তো ?

—কিছু না, কিছু না। আমি হাটেবাজারে খোঁজ নিই নি ?

কনকা অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত রেখে বলল, তুমি সিধে মানুষ। সবাই তোমার মত সিধে নয় গো। এখানেও সমাজ আছে। খোঁজভাঁজ করতে কি খবর বেরিয়ে পড়বে, তখন····

—আমার তো মনে হল দৈবের লিখন কি বা! নচেৎ ত্রিনয়নীতে আগেও গেছি, এনার সঙ্গে কোন আলাপ হয়নি····

—বুঝেছি এখন। আমার মাতামহের সৎভাই। মামাবাড়ির সম্পত্তি পেয়েছিলেন। কোনদিনই তেমন সম্পর্ক ছিল না।

—কিন্তু তোমার কথা কত বললেন!

—আমার মা যদ্দিন ছিল, বাবা খুবই রাখত মায়ের কথা। আমাদের বিয়ের কালে মার কথায় বাবা খোঁজ করে করে সব নেমন্তন্ন করেন, ওরা প্রত্যেককে যৌতুক করেছিলেন।

কনকা স্বভাববিরুদ্ধ নম্র ও ভীরু গলায় বলে, তা, দিনক্ষণ কি ঠিক করেছেন ওরা ?

—আমি শঙ্খ দত্তের বংশধর। বণিক সমাজের আর সুদিন নেই। কিন্তু বংশগৌরব যাবে কোথায় ? দিনক্ষণ পরের কথা। আগে ওরা প্রস্তাব আনুক····

—হ্যাঁ····আনুক···তুমি বিশ্রাম করো।

কনকা বেরিয়ে এসে দাওয়ায় বসল দেয়ালে হেলান দিয়ে।

বুকের ভেতরে ঝড় চলছে। "বিয়ে করো" যখন বলেছিল, তখন তো জানত না যে ব্যাপারটা বাস্তব হতে থাকলে এমন লাগবে।

ছড়ায় বলে, "সবার অধিক কালো কন্যে, বোন সতীনের ঘর।"

নিজের বোন না হোক, বোন তো !

—অ বউ ঃ ভাত যে কড়কড়া হয় ।

আতাপিসির চোখেমুখে কৌতূহল। হঠাৎ গিয়ে ঘরে ঢুকল কনকা, কি বা কথা হল ওদের।

—তুমি খেয়েছ, পিসি ?

—হ্যাঁ....এই খেলাম।

—আরেকবার ডুব দিয়ে আসি।

কলসি তুলে নিয়ে কনকা ঘাটে গেল। কড়ায় দুধ ওথলায়, তার বুকে তপ্ত দুঃখ ওথলাচ্ছে। এই সময়ে মধু বেনের বউ সরস্বতী ঘাটে আসে। বোন সতীনের ঘর করার জ্বালা ও জানে। কিন্তু মধুকর বেনে তো লক্ষ্মী, সরস্বতী দু'বোনকেই বিয়ে করেছিল। দুজনেরই সন্তান আছে। আর মধুকর বেনের মা আছেন মাথার ওপর। দু'সতীনে চুল ছেঁড়ো, এ-ওকে মারো, ছেলেপিলে নিয়ে ঝগড়া করো, এমন তো প্রত্যাশিত।

কিন্তু গলা তুলো না। তাহলে গলা টিপে দেব। লক্ষ্মী-সরস্বতী তাই চুলোচুলি ঝগড়া করে, গালাগালি, ভাবও দেখা যায় সময়ে। ছেলেমেয়ে এক মায়ের ঠোনা খেলে আর মায়ের কাছে যায়। আর কেচাকেচি বেশি হলে মধুকর দু'বউ, ছেলেপিলে, সকলকে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যায়। এর ফলে গৃহশান্তি বজায় থাকে।

সরস্বতী আর কনকা উৎরুনির স্নানঘাটে সই পাতিয়েছিল। এ-ওর "গঙ্গাজল"। বন্ধুত্ব হলায়গলায়। ঘাটে এসে এ-ওর মুখে নাড়ু, আচার, ক্ষীরখণ্ড গুঁজে দেয়। সই না খেলে কি সে সুখাদ্য মুখে রোচে ?

সরস্বতী আজ ভারি হাসিখুশি। সম্ভবত লক্ষ্মী কোন কারণে শাশুড়ির ঠোনা খেয়েছে। এক সতীনের নির্যাতন আর সতীনকে স্বর্গসুখ দেয় তো।

—কি গঙ্গাজল ! সয়া তো ঘরে এল।

—তা এল।

—মুখ কেন ভার গো ?

—কারে আর বলব সই, তোকেই বলি।

ঠোঁট কেঁপে গেল, চোখের জল বাধ মানে না, কনকা মুখে আঁচল গুঁজে কেঁদে উঠল।

—চুপ চুপ! কে শুনতে পাবে, কথা হবে। কথা বড় আগুন বোন! কথা হতে ঘর জ্বলে।

অশ্রুবিকৃত গলায় কনকা বলল, আমার পাট ঘুচল ভাই। তোর সয়া মেয়ে দেখে এসেছে।

—আহা! ছোট বোনটাকে তোর ঘরে দেব বলে বড় আশা করেছিলাম। দাদা সেবারে এল, কথাটা তখনি উঠল।

—আমারে তো বলিস নি।

—সে কি, বোন? তুমি সে মঙ্গলবারের পরে ঘট ভাসাতে যেয়ে আমাদের সবারেই তো বললে, একটা ভাল মেয়ে দেখে সতীন আনব। আমার ত কোলখালি। তা বংশটা রাখতে হবে তো। ও বাড়ির ফুলি বলল, সতীন ঘরে বিয়ে কে দেবে? তাতে তুই রেগে গেলি।

—হ্যাঁ....বলেছিলাম....কিন্তু এখন যেন বুক জ্বলে যাচ্ছে।

সরস্বতী সমবেদনায় বলল, কি বা করবি? অপুত্তক থাকা কি ভাল? ছেলে হলে বংশ থাকে, নয় মেয়ে হলেও....ফুলিরা তো চার বোন। দিদির বরকে ঘরজামাই রেখেছে ফুলির বাপ। দউত্তরকে সব দেবে। তা মেয়ে কোন ঘরের?

—সম্পর্কে বোন হয়। মায়ের খুড়াতো ভাই, তারই মেয়ে। চৌদ্দ বছুরে মেয়ে, সে তো সা'যুবতী। মেয়েছেলে পুষ্পদর্শন না হতে বিয়ে হয়। আর এ....

—কেন বল্ তো আইবুড়ো রেখেছে?

—না কি গুরুতর ফাঁড়া ছিল। এখনি আমি পুরনো হয়ে গেছি। উনোন তাপ, আর অসাগর খাটনি, চেহারা কি থাকে? যুবতী বউ এলে আমার আরোই খোয়ার হবে। ছিলাম রানী, হব দাসী।

সরস্বতী বলল, অমন ভাবিস না। সয়া তো তেমন মানুষ নয়। তোর কোলে ছেলে আসত তো বিয়ের কথাই উঠত না।

—সেও তো জানি।

—বুদ্ধি থাকে, তো হাসিমুখে মত দে। আর নিশ্চুপ তেগুনার কাছে যা।

—সে কি করবে ?

—বউ আনবে সয়া, কিন্তু তোর বশ হয়ে থাকবে। অনেক জানে সে। ফুলির বর কি কম বারমুখো ছিল। এখন ফুলি তারে এমন বশ করেছে যে বলতে পারিনা।

—স্বামীর ভাগ দেয়া যায় ?

—আমারে শুধাস ? আমি তো ভাগের স্বামীই পেয়েছি। কি সেবারে রটে গেল, কি না কি সব্যনাশ হবে, বোশেখের মধ্যে যদি বিয়ে না হয় মেয়ের, তাহলে চিত্তির! বাবা ধড়ফড়িয়ে দু'বোনকে····একা ঘরে একেশ্বরী যদি পুনর্জনমে হই। তবে কি সই! সয়া তো বিয়ে করতই। আরো বয়স গড়িয়ে বুড়াকালে কাঁচ মেয়ে আনলে সেটা কি ভাল ?

কনকা নিশ্বাস ফেলল।

—না, তা কি করে হয়।

—কাঁচ ছেলের হাত ধরে বুড়া বাপ যাবে ? সুধন্য আচার্যকে দেখে বুঝিস না ?

সুধন্য আচর্য, ব্রহ্মকেশব আচার্যের ভাই। কবে যৌবনে ঘর ছেড়ে সন্ন্যেসী হতে গিয়েছিলেন। সবাই জানত তিনি অট্টহাসে, বক্রেশ্বরে, উদ্ধারণপুরে থাকেন। শেষে কোনো নামীডাকী সন্ন্যাসী বললেন, তোমার হাতে আছে গৃহধর্ম। ঘরে যাও, সংসার কর, এ পথ তোমার নয়।

কত বছর বাদে ফিরলেন। পাকা চুলে বিয়ে করলেন মাটির পুতুলের মত একটা একরত্তি মেয়ে। এখন সেই বউ সেয়ানা হয়েছে, ছেলেমেয়ের মা। ছেলের হাত ধরে সুধন্য হাঁটেন, দেখে

বাজারিয়া লোক হাসে।

তাঁর বউ শিবপ্রিয়া এখন ভরত আর সীতার মা। বয়স কনকার চেয়ে কম, স্বভাব ঝিনকুটে পাকা। গলা তুলে সে ঝগড়া করে, আমার বর বুড়ো তাতে পাড়াপড়শীর কি?

আর সুধন্য সগর্বে বলে বেড়ান, গুরুর আদেশ তো ফেলতে পারি না। সংসারের ভোগ আকাঙ্খা যে ছিল, তাই তো জানতাম না।

এখন সুধন্য তাঁর জমিজমা নিজেই দেখেন, হিসেব রাখেন। যেমন তৎপরতায় আমিনের সঙ্গে দৌড়ান, দুষ্টলোকে বলে, সন্নেসী হতে যাননি, কোন বা কাছারিতে আমিনের কাজ করতেন।

তাঁর কথা মনে হতে কনকা ঈষৎ ম্লান হাসল। সরস্বতী বলল, বুড়ো বয়সে মরবে, দুধের ছেলে রেখে যাবে, কাঁচ বউ বিধবা হবে, তেমন হওয়া কি ভাল? আমারে যা বললে তা বললে। আর কারেও বলিস না সই। কথা যেন বা' বাতাসের আগে ধায়। এখন ডুব দে, ঘরে যা, খেয়েদেয়ে শান্ত হ।

কনকা বুঝল, বন্ধ্যা মেয়েছেলে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মতি না দিলে সমাজে সে কারো সমর্থন পাবে না। ডুব দিল সে, ঘরেও গেল, কিন্তু খেল না।

ভাতের থালা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিল। খাক, কুকুরে বিড়ালে পাখিতে খাক। আমি তো নিত্য খাই। একদিন ওরা খাক।

॥ ৫ ॥

রাতে কনকা মান করে বসল। সম্মতি দেবে না কেন, দেবে। মান ভাঙাক স্বামী।

এই তো শেষ। শেষে সে হবে বড় বউ। দুয়ো। আর তিনি হবেন ছোট বউ, সুয়ো। স্বামী কি তার মান ভাঙাবে? আগে যখন শাশুড়ি খুব ছেঁচত, গণপতি রাতে হয় আলতাপাতা, নয় পলার বালা, নয় একটি টাকা দিয়ে কনকার মান ভাঙাত।

এখন কি আর ভাঙাবে ?

কনকা আঁচলে মুখ ঢেকে বসে আছে দেখে গণপতি বলল, আবার কি হল ?

—আমার কথা জেনে কি হবে ?

—তোমার কথাই তো ভাবি।

—ভাবলে বিয়ে ঠিক করতে ?

—শুধু কি নিজের কথা ভেবেছি ? তোমার কথা ভাবি নি না কি ? আর এটাও সত্যি, যে তুমি যদি বিয়ে করো, বিয়ে করো না বলতে····

—না বলে কি করতাম ? শূন্য ঘর তোমার অসহ্য হয়েছে····

—কাঁদ কেন কনকা ?

—সে কি ছেলে নেই বলে, না আমি বুড়ো হয়েছি বলে ? এত-কাল দেখতে দেখতে তোমারও বোধহয়····বেটাছেলে বলে কথা !

গণপতি সোজা বুঝের মানুষ। সে বলল, ও কথা বল না কনকা। কেউ বলতে পারবে, কোন মেয়েছেলের দিকে আমি চোখ তুলে তাকাই ?

—না, তা কেন বলবে ?

—দেখ ! অতশত বুঝি না। তবে কোন দশ বছরে এসে হেঁসেলে ঢুকেছ, আজ বারো বছর উনোনের তাপে তোমার কষ্ট দেখছি।

কনকার মন বলল, অতিথবিতিথ নিয়ে যখন আস, তখন তো মনে হয় না কষ্ট দেখছ ?

মুখ বলল, মেয়েছেলের রাঁধতে কষ্ট হয় ?

—তুমি যে আমার আদরিনী গো, মাথার মণি ! রাঁধতে রাঁধতে হাতে হলুদের দাগ, কপালের সামনের ঝুমরো চুলগুলি উঠে যাচ্ছে, মুখের রং তেমন গৌরবর্ণ দেখি না, এ কি আমার সয় ? বউ এলে তুমিই রানী থাকবে। সে হবে তোমার দাসী। সংসারের ঝামেলা তার ওপর ফেলে দিয়ে একটু জিরোতে পারবে। তোমার সংসারে

একটা লোক বাড়বে, এই তো !

কনকার মন গলতে থাকল।

—হ্যাঁ⋯কিন্তু যুবতী মেয়ে ! বেটাছেলেকে বশ করতে কত ছলাকলা না জানবে !

—ধুস ! দেখেই এলাম, তেমন নয়।

—ওটুকু দেখেই বুঝলে ?

—বাপকে দেখলাম তো⋯খুব রাগ ! এমন হুঙ্কার দিয়ে কথা বলে, বউ-মেয়ে কাঁপে।

—সে তো ভালো।

—তুমিও তাকে ধমকে ধামকে⋯যাকে বলে তৈরি করে নেবে।

—তা আর করব না ?

—আর কি জান ? আঁটকুড়ো, আঁটকুড়ো, এ নাম আর সয় না। এই ব্যবসাব্যাপার, ঘরদুয়ার, আমবাগান, কলাবাগান, মাছের পুকুর, গোয়ালে গাই, সম্বৎসরের চাল কিনে রাখি, তেল কিনে রাখি, খাবে কে ? কারে দিয়ে যাব ? ভাইরা দেশান্তরী, তাদের ছেলেরাই সব্বস্ব পাবে ? এর যদি⋯ছেলে হয়⋯সে তোমাদের দেখবে। বল ?

কনকা বলল, বুঝেছি। আর চিন্তা করব না।

—সংসার তোমারই থাকবে। তাদের ঘরে অসাগর দাসদাসী। সে মেয়ে সংসারের জানে কি ?

—দেখো, তার কষ্ট হবে না তো ?

—মেয়েছেলে যার হাঁড়িতে চাল দিয়ে জন্মেছে, তার ঘরে যাবে।

—বুঝলাম। নাও, এখন ঘুমোও।

—কাছে এস।

কনকা কাছে এল। গণপতির কনকাতে একটা অভ্যাস। প্রাত্যহিক স্নানখাওয়ার মতই। অনেকক্ষণ বাদে দুজনে ঘুমাল।

নন্দরানী পাড়া সম্পর্কে অহনার ভাজ, হৃদয়ের সম্পর্কে বন্ধু।

নন্দরানীর বাপের বাড়ি থেকে "হলুদষষ্ঠী" ব্রত শিখে এসেছে,

আজ ওর ব্রত উদ্‌যাপন ছিল। অহনা ওদের বাড়িতে খেতে গেল। চোদ্দ বছরেও আইবুড়ো থাকার কারণে অহনা মনে মনে মরমে মরে থাকে। সমবয়সী মেয়েদের বিয়ে হয়েছে, ওর হয়নি। কি সে ফাঁড়া ওর কোষ্ঠীতে আছে, তাও জানে না, শুধু জানে "ফাঁড়া"।

হোমযজ্ঞ এটাসেটা করে কত ফাঁড়া কাটানো যায়, এ ফাঁড়া কাটানো না কি যায় না।

নন্দরানী বলে, অত ভাবিস কেন? তুই ভাগ্যবতী যে মায়ের আদর বেশি করে পেয়ে নিলি। মেয়েছেলের জীবন অহনা, হাসবে খেলবে বাপের ঘরে, কাঁদবে গিয়ে শ্বশুরঘরে।

—কই, তুমি তো কাঁদ না?

—আমার স্বামীটি যে নাকে দড়িবাঁধা মহিষ গো! দড়ি আমার হাতে।

—দু'জনে যোটকও হয়েছে ভাল। যেন লক্ষ্মীনারায়ণ! সবাই বলে।

নন্দরানী স্বামীগর্বে ঝলমল করে। তার স্বামীই রোজগেরে, বাপের গদীতে বসেছে। সৎশাশুড়ি সতীনপো আর বউয়ের মন রেখে চলেন। ফলে নন্দরানীর সুখের সংসার।

অহনা নেয়ে ধুয়ে ও বাড়ি গেল। নন্দরানীর ছেলেটিকে আদর করল, সুপরি কুচিয়ে পান সাজল, তারপর ব্রত উদ্‌যাপন দেখতে বসল।

—এ ব্রত করলে কি হয় বউঠান?

—সন্তানের মঙ্গল হয়, মরুঞে পোয়াতির সন্তান মরে না, এমন কত! আমার ভাজেরা করে, আমিও করলাম।

ব্রতকথা হয়ে গেলে ওরা খেতে বসল। খেয়েদেয়ে নন্দরানী বলল, চল্ ঘরে বসি।

—আজ ঘরে যাই?

—চল্ না। ঘরে আমি পৌঁছে দেব। এই বালা জোড়া কেমন হল?

—লবঙ্গফুল বালা! বেশ হয়েছে। নতুন যে!

—তোর দাদা গড়িয়ে আনল। বলে, নতুন ব্রত, নতুন বালা ছাড়া হয়?

—আরো আরো ব্রত নাও, প্রস্থ প্রস্থ গয়না পাবে।

—আর কত পরব? অনেক আছে ভাই।

—পরলে মানায় বটে।

—তোকে কি কম মানাবে? অনেক দেখি, তোর মত সুন্দরী তো চোখে দেখি না।

—ও মা! সে কি কথা?

অহনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, বাবা সতীনঘরে দিচ্ছেন বউঠান! সম্পর্কে না কি আমারই পিসাত বোন।

—ঘর কোথায়?

—দামিন্যাতে।

—কই, খুড়ীমা তো বললেন না কিছু?

—বলবে…সময় হলে…

—চোখ মোছ্, চোখ মোছ্ অহনা।

—বাবা এবার মেলাতে দিদির বরকে ধরে ঘরে আনলেন। এমন তো বাবা আনেন, আমি তো সামনে যাই না। মা থালা নিয়ে যায়। এবারে বলে, আমার জ্যেঠাতো ভাগ্নীর জামাই। তারে যত্ন করে খাওয়াতে।

—দেখতে কেমন?

—আমি তো তেমন চেয়েও দেখিনি। তবে…তোমার বরের মত নয়। হবে বা কি করে! এই বিয়েই তো বারো বছর হয়ে গেল।

—ছেলেপিলে আছে?

—হয়নি। আমার বড় ভয় করছে বউঠান!

—ভাবিস না। লাখ কথায় বিয়ে হয়। আর খুড়োমশাই তোরে চক্ষে হারান। তিনি কি তোকে এমন বিয়ে দেবেন?

—জানি না।

—চল্, তোরে দিয়ে আসি।

—আমি চলে যেতে পারব।

—না গো না। চলো! —আমি খুড়ীমাকেই বলি আগে।

—মা কি করবেন? বাবাকে চেনো না তোমরা। সে লোক যা মনে নেয় তাই করবে। জীবনে সে পরের কথা শোনে নি।

—নয় তুই তোর মাকে বল?

মায়ের কাছে চুল বাঁধতে বসে অহনা কেঁদে ভাসিয়ে দিল।

—মা, তুমি না আমায় চক্ষে হারাও?

—সে কি আর বলতে হবে মা?

—তাতেই বোন সতীনের ঘরে দিচ্ছ?

—তোর বাবা····

—বাবার মতিচ্ছন্ন হয়েছে মা! খানাকুল হতে সম্বন্ধ এল, বাবা বললেন, আমার মেয়ে মেট্যা ঘরে থাকতে পারবে না। কা-গ্রাম থেকে সম্বন্ধ এল, বাবা বললেন অত দূরে মেয়ে দিলে দেখতে যেতে পারব না। এখন কেন বা আমাকে বোনসতীনের ঘরে বুড়ো বরে দিচ্ছে?

—বুড়ো কোথা রে মা?

—বারো বছর এক বউ নিয়ে ঘর করছে, তবে বুড়ো হল না?

—নে, থির হয়ে বোস্।

—ন' বছরে কেন বা বিয়ে দাও নি? তখন কাঁচ গাছের ডাল। আর গাছের বাকলে কাদা দিলে লেগেই যায়।

—অহনা! তোরে ভাসিয়ে দিলে আমিও জলে ঝাঁপ দেব। ভাবিস না অমন করে।

—কেমন করে জানব বাবার মনে কি ছিল? তিনি বলতেন,

আমি ভাত-জল দিতাম। সামনে যেতাম।

মা ভাবলেন সেই তো! অহনা সোনার পুতুলি, চলমান প্রতিমা। কেমন করে তাঁর গর্ভে এমন মেয়ে এল, সেই তো ভাবতেন বসে বসে।

অতিবড় সুন্দরীর তো কপাল ভাল হয় না।

তাঁর পিতৃবংশে বুঝি বা বাবার পিসিই দিলেন কিরণমালা। এত রূপসী, যে দেখত, সেই ঘরে নিতে চাইত।

গ্রামে নৌকো নিয়ে বেদেরা এসেছিল। তারাই তাঁকে চুরি করে নিয়ে যায়!

আর তো খবর মেলে নি। কিরণমালার মা মনোদুঃখে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে কেঁদে মরে যান।

তাঁর অহনা, তাঁর অহনা!

—যাও মা, মুখ ধোও, কাপড় ছাড়ো, ঘরে দোরে পিদিম দেখাও, জলছড়া দাও।

অহনা কাঁকই, পিতলের আয়না দিয়ে উঠে যায়। এই সরু কোমর, এই পিঠঝাঁপা চুল, এই সরস্বতীর মত নির্মল শুভ্র গায়ের রং, ডাগর ডাগর চোখে নিষ্পাপ চাহনি, শ্বেতপদ্ম কি শ্মশানের দহে ফেলবেন?

অতি বড় সুন্দরী যে সুখী হয়, অহনাকে দিয়ে তা প্রমাণ হোক।

কতকাল, কতকাল ধরে এ সব কথা মেয়েরাই বলে, মেয়েরাই শোনে।

"গঙ্গা—যমুনা—গোমতী—সরস্বতী ভিন্ন আন নদীর নামে নাম রাখলে সে মেয়ের কপালে ছাই। মহানন্দার বাপ তা মেনেছিল? এখন দেখ, মেয়েকে কলঙ্ক দিল ননদ, মেয়ে যেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল।"

না, অহনা জ্যোতিষঠাকুরের দেয়া নাম। ও নামে কোন নদী বহে চলে না।

"যে মেয়ে রবিবারে ঋতুমতী হয়, সে বিধবা হয়।

সোমবারে হলে সে পতিব্রতা।

মঙ্গলবারে হলে, ছি ছি, সে বেশ্যা হয়। হায় গো! পারঘাটের বেশ্যারা কি সবাই মঙ্গলবারে ঋতুমতী হয়েছিল?

বেস্পতিবারে হলে স্বামীর ধনসম্পদ হয়।

শুক্রবারে হলে বহুপুত্র হয় মেয়ের, সবাই বেঁচে থাকে।

শনিবারে হলে সে মেয়ে বন্ধ্যা হবে।"

অহনা যেদিন রজস্বলা হয়, সেদিন অহনার মা বেস্পতিবারে লক্ষীপুজো করেছিলেন, স্পষ্ট মনে আছে। না কি সেদিন নয়?

কে কত মনে রাখবে বলো?

মনে ভাবতে গেলে যেন মনে হয় অহনার মা ছোট মেয়েটি হয়ে গেছেন। ঠাগমার পাশে শুয়ে দেখছেন বর্ষায় নিদুলি পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে পিদিম ঘিরে।

ঠাগমা ঘুমঘুম গলায় বলছেন,

"পতি লইয়া সতী বসে চিতার উপরে
রমণীরা উলু দেয়, জয়ধ্বনি করে
আপনি জ্বলিল চিতা ধু ধু হুতাশন
দেবলোকে আহ্বান করে দেবগণ...."

অহনার মা বলছেন তারপর?

—তার আর পর কি? কালকে শুনিস।

—অ ঠাগমা, আমার নাম যে সতীরানী?

—তাতে কি লা?

—আমারেও কি চিতায় দেবে?

—তাই কি কেউ দেয়? তোমার বে' হবে, শ্বশুরঘরে যাবে, সাত বেটার মা হবে, সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে সগ্যে যাবে।

নাঃ স্বামী জ্বাজ্বল্য জীবিত, তিনিও এক বেটা এক বেটির মা। স্বামীর কথা চিরকাল মান্য করেছেন। কিন্তু প্রাণপুতলী অহনা

বলে কথা !

দরকারে অমান্য করতে হবে।

অহনার মা বসে থাকলেন না। তিনি নাপিতনীকে ডেকে পাঠালেন। হাতে করকরে দুটি টাকা দিয়ে দামিন্যা পাঠালেন। তোকে আমি নতুন কাপড় দেব নাপিত বউ। তুই আমারে সকল সংবাদ এনে দে, তোর ব্যাগ্যতা করি।

—দামিন্যায় আমার ননদের বিয়ে হয়েছে। চারটি চিঁড়ে বাতাসা, একছড়া কলা দাও মা! তার বাড়ি যাব আর সব্যস্ব জেনে আসব।

—এসে সত্যি কথাটি বলবি মা।

—সেথা দিদির বিয়ের কথা হচ্ছে?

—যা না, হলে তো জানবিই। সেথা যেন বসে থাকিস না।

—না না, যাব আর আসব।

—আমি পথ দেখব বউ!

তা নাপিত বউ বুধবারে গেল, শুক্রবারে এল। শচীপতি যখন দোকানে, তখন সে এসে বসল।

—ঘরে চলো মা!

—চল্, কখন এলি?

—এই তো! কর্তা না বেরোলে তো ঢুকতে পারি না।

ঘরে বসলেন দু'জনে।

—গলা নামিয়ে বল্।

নাপিত বউয়ের কথা শুনে অহনার মার মনে হল সামনে অন্ধকার নদী, অহনাকে হাত পা বেঁধে সেই জলে ফেলে দিচ্ছেন।

অনেক, অনেক কথা বলল নাপিত বউ। তারপর সে উঠল।

আর অহনাকে মা বললেন, বাপ ঘরে ফিরতে না ফিরতে আতিপাতি জল গামছা নিয়ে দৌড়ে যাবি না।

—কেন মা ?

—আমি বললাম, তুমি শুনবে। রাতেও ভাত জাগিয়ে বসে থেকো না। সন্ধে নাগাদ খেয়ে ঘরে চলে যাবে।

অহনা ভাবল, দাদা শ্বশুরবাড়ি গেছে বউ আনতে, এখনো ফেরেনি, তাতেই মায়ের রাগ হয়েছে। কিন্তু মা তো জানে, যে দাদার যেতে আসতে চার-পাঁচ দিন যাবে ?

—না কি, বউঠানের কথা শুনে মা বলবে বাবাকে ? নিজের খাটে শুয়ে অহনা আড়ি পাতবে।

শচীপতি ঘরে ফিরে অহনাকে দেখেন না। সন্ধেবেলা পুরুত এসে গৃহদেবতার আরতি করে শয়ন দিয়ে গেলেন, অহনা শান্তিজল নিয়ে উঠে গেল।

স্ত্রীর মুখ থমথমে। শচীপতি ভাত খাবার কালে বললেন, অহনা কোথায় ?

—তার ঘুম লেগেছিল, খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

—কেন, ঘুম লাগল কেন ?

—ঘুম লাগল, আর কি বলব ?

—তা, জামাই কেমন দেখলে ?

—দেখলাম ! এই যে পায়েস।

কোন কারণে মন ভাল নেই গৃহিণীর হয়তো। ক্ষেমঙ্কর বউ আনতে গিয়েছে, দেরি করছে, সে জন্যই কি ?

—না কি মেয়ে পরের ঘরে যাবে বলে মন খারাপ ? এমন মুখ তো দেখেননি গৃহিনীর ? রাতে শুধাতে হবে।

রাতে গৃহিনী ঢুকলেন, মুখ থমথমে।

—কি হল তোমার আজ ?

—দাঁড়াও, দরজা বন্ধ করি।

—আজ তুমি এ ঘরে এমন মুখ করে····?

—অহনার এ বিয়ে হবে না।

—তার মানে ?

গৃহিনী কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

—বিয়ে দেয় তো বাপ আগে খবর নেয়।

—খবর নেব না কেন?

—কি দেখে বিয়ে দিচ্ছ বলতে পার? নাপিত বউ যেয়ে সব দেখেশুনে এসেছে। মাট্যা ঘর। দাসী বলতে একজন, কিছু গাইছাগল আছে। আর আমকলার বাগান, সে কার থাকে না? ধনদৌলত দেখে তো দিচ্ছ না!

—দরিদ্র তো নয়। আর কে বলতে পারে গণপতির অবস্থা ফিরবে না?

—সেও মানলাম। মনে সুখশান্তি থাকলে বনের মধ্যে ঘর বেঁধেও মানুষ সুখে থাকে। কিন্তু সতীনের ঘরে মেয়ে দিচ্ছ? একে সতীন, তায় বোনসতীন, তোমার ভাগ্নী কনকা!

—কনকা....হ্যাঁ....সে তো জানি।

—না, তার স্বভাব জান না। কল্লা মেয়েছেলে, দুরন্ত দজ্জাল, শাউড়ি রোগে পোড়ো হয়ে যায়, খুব খোয়ার করেছে। গণপতি ঘরে থাকে না কেন? কনকার জন্যে।

—এসব কথা রটনা।

—রটনা কি এমনি হয়? বরের বয়স অনেক, দেখতে বা কি! সে ব্যবসাব্যাপারে বাইরে থাকবে, কনকা মেয়েকে আঁশবটিতে কুটবে। আমি সতীন ঘরে মেয়ে দেব না।

—বল, বলে নাও।

—কনকা এতদিন একেশ্বরী হয়ে আছে। সে সতীনকাঁটা সইবে? কোন মেয়েছেলে সয়? অহনা আমার বুকের পাঁজর বললে হয়। অমন ফুলের মত মেয়ে আমার! তার জন্যে দোজবরে এনো না, এনো না, এনো না। অমন বিয়ে দেবার চেয়ে মেয়েকে নিয়ে আমি ডুবে মরব! মেয়েছেলে কি পাথর, না কাঠ? যেথা ইচ্ছা সেথা রাখবে? হায় হায়, এমন নিমায়া হলে কেমন করে?

—আর কি বলব?

—শান্ত হও, বলছি।

গৃহিণী চোখ মুছে নাক টানলেন। জল খেলেন ঢকঢকিয়ে। বললেন, বলো!

শচীপতি কপাল চাপড়ালেন।

—তুমি আমি বলার কে? এ অহনার নিয়তি। দেখ! রজস্বলা আইবুড়ো কেন, এ কথার উত্তর যে ফাঁড়া ছিল, তা মানতে চায় না কেউ। নইলে কুলেশীলে অমন সম্বন্ধ, সেই রুদ্রাণী গ্রামে! ছেলে যেমন, ঘর তেমন, কথা হতে হতে ভেঙে গেল।

—রুদ্রাণীতে? শুনিনি তো!

—শোনোনি, আমি বলিনি বলে! অষ্টপুরের সম্বন্ধটি ভেঙে গেলে বড় কষ্ট পেয়েছিলে, তাতেই বলি না আর। চেষ্টা করে যাই।

—কোষ্ঠী দেখালেই হয়।

—প্রস্তাব গেলেই খোঁজভাঁজ নিয়ে যদি "না" করে, কোষ্ঠী দেখাব কারে?

—কেন এমন হচ্ছে?

—কেউ ভাংচি দেয় সন্দেহ করি। ভাংচি দেবার মানুষের তো অভাব নেই।

গৃহিনী এসব সম্ভাবনা তো ভাবেন নি।

—বিশ্বাস কর না, অহনার মা?

—না না, বিশ্বাস করছি। তবু সতীন ঘরে....

—তুমি ভাব সতীনের কথা, আমি ভাবি বেশি খুঁজতে যেয়ে কি বা অঘটন হবে। হয়তো বিয়েই হবে না। আর আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রাখলে সবংশে নরকে যাব।

—মা গো! বল না অমন কথা।

—অহনার কোষ্ঠীর কথা ভুলে গেলে?

—ভুলব কেন?

—আরেকবার মন্দিরের পাশে যে টোল, সেই আচার্যকে দিয়ে পড়িয়ে নিলাম। বললেন, দোজবরে বিয়ে হবে, সতীন থাকবে,

সন্তান হবে, সুখী হবে, বৈধব্য যোগ নেই। তবে চতুর্দশ পূর্ণ হয়ে পনেরয় যেন না পড়ে।

—সুখী হবে।

—সুখী হবে। দেখ! অহনা আমার চোখের মণি বললে হয়। কিন্তু বর তো পেতে হবে। গণপতিকে পেলাম, অপুত্রক মানুষ, বউ খুঁজছে। মেয়ের বয়স শুনেও আপত্তি করল না। চেহারা? বেটাছেলের যেমন হতে হয়, খাটাপেটা চেহারা। কুলেশীলে খাটো নয়। বল্লালসেনই মারল আমাদেরে। নইলে ওর পূর্বপুরুষেরও নৌবহর ছিল। তাম্রলিপ্ত থেকে সুবর্ণদ্বীপ যেত। যাক গে। সকলেরই ছিল, কারোই নাই, সে কথা ভাবি না।

—কনকা যে····

—মানুষ সোনাদানায় বশ হয়। আমি নিজে যাব দামিন্যা। নারকেল, পান, সুপারি নিয়ে যাব। তখন কনকাকে সোনার বালা আর গঙ্গাজলী শাড়ি দিয়ে আশীর্বাদ করব। তারপর? অহনার ভাগ্য। কনকার সম্পর্কে যা বললে, আমি বললাম রটনা। কেন বললাম? কারণ না থাকলেও কথা রটে। নচেৎ অহনার নামে কথা রটে?

—মানুষ কত ক্ষতি না করে!

—ত্রিনয়নীতে আমরা ষোল ঘর বেনে। অহনাকে ভালবাসে না কে? কেউ বলল, আমার শালা আছে, ভায়রাভাইয়ের ভাই আছে, সম্বন্ধ এল একটা? গত বছর তো পাঁচটা মেয়ের বিয়ে হল!

গভীর নিশ্বাস ফেললেন অহনার মা! বললেন, সবই আমার ভাগ্য! না, আর কিছু বলব না। মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছে···· সোনার পদ্ম মাধ্যাডোবায় যাবে, ভাগ্য!

—স্বামীর মন বসলে ওর মহাসুখ হবে। বয়সে বড়? তা হিমালয় তো বুড়োশিবের হাতে পার্বতীকে দিয়েছিলেন।

—ঠাকুরের কথা ঠাকুর জানে।

—এবারে শোও, রাত হয়েছে।

রাতে শুয়েও অহনার মার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। কে নিয়তির বিধান লেখে, কোন সর্বশক্তিমান। সে কেন অহনার কপালে এমন বিধান লিখল ? অহনা নিখাদ সোনার পুতুল, তাপ লাগলে গলে যাবে। মেয়েকে দিয়ে এত ব্রতপূজা করানোর ফল কি পেল সে ?

বিনিদ্র রাত কাটল মায়ের, পাশের ঘরে মেয়ের। অহনা মশারির চালের দিকে চেয়ে শুয়ে রইল। তাহলে এই তার নিয়তি, বিধির বিধান ! তাকে নিয়ে বাবার এত চিন্তা, এত অপমান ! তাহলে যা হবার তাই হোক। যা যা ঘটবে সবই পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তি। আহা ! যদি অবোধ শৈশবে ফিরে যাওয়া যেত ?

পরদিন প্রত্যুষে যে অহনা বিছানা ছেড়ে উঠল, সে তো অন্য অহনা। ঘাট গেল, এসে কাপড় ছাড়ল। বাগালকে বলল, দোহানিয়াকে ডাক, গাই দুইবে।

ঘরের দোরে জলছড়া দিল, খাঁচার পাখিকে জল, ছোলা, ফুল দূর্বা তুলে ঠাকুরঘরের দোরে রাখল, চন্দনপাটা নিয়ে বসল।

মা বললেন, আমারে ডাকনি মা ?

—না, ঘুম ভেঙে গেল।

—মুখে কিছু দেওনি ? তুমি যে দুধের সর মুড়কি বিহানে খাও ?

—মা ! তোমার কাপড় গামছা রেখেছি।

এ অহনার চোখ হাসে না, মুখ হাসে না, ধীরস্থির অন্য মেয়ে যেন।

—অহনা !

—সব আমি শুনেছি মা, ভেব না। যাও, সকালে কত কাজ ! ভেব না ! মেয়ে সন্তান তো পরের হাতে দিতেই হয় মা !

॥ ৬ ॥

মুকুন্দর বউ মুকুন্দকে বলল, শুনেছ ?

কি শুনব ?

—গণপতি বেনে নাকি কোন টুকটুকে সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করছে। খুব বড়লোক গো !

—কেন ? গণপতির তো বউ আছে।

—আহা ! সে বাঁজা নয় ?

—বউ যদি বা বাঁজা হয়, তাহলেও আরেকটা বিয়ে করা আমার ভাল লাগে না।

—আহা ! সবাই করে গো !

—আমার ভাল লাগে না। সবাই করেও না। রামাইয়ের দাদা করেননি। স্বামী-স্ত্রী রামাইয়ের ছেলেপিলেকেই মানুষ করলেন।

—সে কোটিতে গোটীক। ধরো যদি আমি বাঁজা হতাম, তুমি আরেকটা বিয়ে করতে না ?

—পরজন্মে দেখা যেত। এ জন্মে তো করতাম না।

—থাক ! এখন শোন। তালপাতায় অনেক লিখেছ, অনেক পড়েছ, এখন শোন।

—শুনতে পারি, যদি আমার বাহুর ওপর মাথা রেখে শোও !

—এই শুলাম।

—তেলের যে সুবাস খুব !

—হবে না ? বেনেতি মসলা কর্পূরে ভিজানো তেল। বেনে বউদের অত চুল, অত রূপ, ওরা অনেক জানে গো !

—এই তোমার বলার কথা ?

—না না, শোনো। নানা তত্ত্বতাবাস সাজিয়ে ত্রিনয়নী থেকে

মেয়ের বাপ, ভাই, পুরুত নিয়ে কথা কইতে এসেছিল কনকার সঙ্গে।

—কনকা! যাকে বলো টোকো আম!

—নয়তো কি! বাইরে দেখতে টুকুটুকে, ভেতরে শুধু সন্দেহ আর সন্দেহ। মুখও খুব।

—তা বিশ্বাস করি, মাঝে মাঝে গলা পাই তো! তা এরা তো বেশ লোক! সভ্যভব্য মনে হচ্ছে। বাড়িতে বড় কেউ নেই তো প্রথম বউকেই বলতে এসেছে। বেশ ভাল।

—এতটা তো কেউ করে না। বেটাছেলের মন হয়, বিয়ে করে আসে।

—আমি যেমন তোকে····

—আবার তুইমুই? আর তুমি কতটুকু ছেলে তখন? মা উৎরুনির স্নানে গিয়ে আমাকে পছন্দ করে আনেনি? বলে আসেনি, বোন! তোমার মেয়েটিকে আমি নেব?

—ওই তো! খালি নিজের কথা!

—না না। মেয়ের বাপ এসে কত ব্যাগ্যতা করে কনকাকে বলেছে, তোরই বোন হয় মা! তোমার মা আমার জ্যেঠাত বোন ছিলেন! ছোট বোনটিকে তোমাদের ঘরে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই! আর কি জানো?

—কি? মেয়ে পাঁচালী আমি কি জানব?

—কনকাকে এই ঝলমলে গঙ্গাজলী শাড়ি দিয়েছে, নতুন সোনার বালা! বলেছে, মামা দিচ্ছে, নাও মা!

—গঙ্গাজলী কেমন শাড়ি?

—সে তুমি বুঝবে না।

—কেন বুঝব না?

—সে খুব দামী শাড়ি গো! মা বলতেন, একদিন তুমিও পরবে মা!

—সত্যি! আমার হাতে পড়ে····

—চুপ করো তো?

বলতে এলাম গণপতির কথা····

—কনকা মত করেছে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, গলে গেছে একেবারে।

গলেই গেল কনকা! বলল, আমার দাসী হবে, সেবা করবে, একি বলেন মামা ? সে ছোটবোন, আমি দিদি। দুবোনে কাজ করব, গল্প করব, মনের সুখে থাকব।

—তার সন্তান হলে সে তোমারও হবে।

—নিশ্চয়। আমি তার বড় মা হব! তবে আমার ঘরদোর তো দেখছেন।

—লক্ষ্মীর সংসার মা! আর মেয়েছেলে যার হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছে, সেখানেই তো যাবে!

শচীপতি সব লক্ষ্য করে দেখছিলেন! হোক মাট্যাবাড়ি, তবু উঁচু উঁচু ঘর, চালে নতুন খড়। ঘর ও বহিরাঙ্গন লেপাপোঁছা। চারদিকে সব ঝকঝক করছে যেন। কনকা বলল, তেলগামছা কাপড় দিই, স্নান করে আসুন, আমার সব তৈরি।

—বিয়ের কথা বলতে এসে খেয়ে যাব ? সে কি হয় মা ?

—ভাগ্নীর ঘরে মামা খাবে, দাদা খাবে। আর পুরুতঠাকুরকে আমাদের আচার্যিমশাই নিয়ে গেছেন। না খেলে বড় দুঃখ পাব।

স্নান হল। নতুন থালাবাটিতে সাত ব্যঞ্জন, ভাত খাওয়া হল।

—তোমার রান্না আমার মা মাসির মত।

—শাশুড়ি যে বিখ্যাত রাঁধুনী ছিলেন। সমাজে যার বাড়ি যে যজ্ঞি হোক, ওঁকে নিয়ে যেত।

—তা হলে মা! দিন ঠিক করি ?

—করুন মামা। এতে আর কথা কি ?

কনকাও নতুন হাঁড়ির মুখে সরা দিয়ে নতুন কাপড় হাঁড়ি বেঁধে ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরকান্তি, ক্ষীরের গজা দিল, এক কাঁদি অগ্নীশ্বর কলা।

বলল, অহনার ঘাড়ে সংসার ফেলে আমি মামাবাড়ি দেখে আসব।

—তাই যেও মা! বিয়ে হলে মেয়ের বাপের জ্বালা তো জান। দৌহিত্র হলে তবে দেখতে আসব।

—সে তো বটেই। খবর নিবেন, লোক পাঠাবেন।

—আজ আসি মা!

কনকা গড় হয়ে প্রণাম করল।

মন খুব, খুব খুশি তার। সে একটা ভাল কাজ করছে। বংশধর কামনায় সানন্দে সতীন আনছে। আর চিড়ে, নারকেল, দই, ঘি, মিষ্টান্ন, নানাবিধ জিনিস পাঠিয়েছে ওরা, তাতেও সে খুশি।

পাড়াপড়শীকে ঘরে ঘরে বিলোবে। দেখুক সবাই, কেমন ঘর থেকে সে সতীন আনছে।

বালা জোড়া কি সুন্দর! কোন সেকরা গড়েছে? এমন কারুকার্য? গঙ্গাজলী কাপড়টি বা কত সুন্দর!

কনকা গণপতিকে বলল, বউ বরণ করব, আমার নতুন গরদ চাই, নতুন চুড়ি, আর গলায় মুড়কিমালা।

গণপতি একশোটি রুপোর টাকা কনকার কোলে ঢেলে দিল।

—সব করে নাও!

কনকার মনে হল, যে মেয়ে আসছে সে সর্বসুলক্ষণা। নইলে গণপতির হাতের মুঠ খুলল? অপুত্রক গণপতি বড় সঞ্চয়ী, বড় বিষয়ী।

বলল, ছুতার ডাক। মায়ের খাটপালঙ্ক পালিশ করাব। অহনার তো ঘর চাই একটা! আর, উঠানে ছামুনি দিয়ে লোক খাওয়াব। ওরা দেখুক, কেমন ঘরে মেয়ে দিচ্ছে!

বিয়ের আগে প্রত্যাশিত কুটকচালি কম হয়নি। অবশ্য শচীপতি আবার এসে কনকাকে বলেছিলেন, যে সমাজে নানারকম লোক থাকে। পাঁচমাথা এক হয়ে ধুয়া তুলেছিল, অহনার কোন দোষ থেকে থাকবে, নইলে চতুর্দশী কন্যা অনূঢ়া কেন রইল। তা আমি তাদের লয়ে খরচপত্র করে রামাচার্য জ্যোতিষশাস্ত্রীর কাছে গেলাম। তাঁর তৈরি

জন্মপত্রিকা তাঁরে দিয়েই পড়ালাম। এত কিছুর পর সমাজ মেনে নিল। অহনা নির্দোষ, কিন্তু এতাবধি এইসব কলঙ্ক-অপযশ তাকে সইতে হয়েছে। তা, তোমরা জন্মপত্রিকার কথা জান। তোমাদের পুরোহিত দেখেছেন। তোমরা চাও তো আরো কারে দেখাতে পার।

—অবিশ্বাস তো করিনি মামা।

—তবু মা! দেখিয়ে নাও। সাবধানের মার নেই। দামিন্যার সমাজে এ নিয়ে কথা হয় তা আমি চাই না। এখানে কারে দেখাবে বল?

গণপতি করজোড়ে বলল, আজ্ঞে, ঠাকুর মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কয়েকপুরুষে জ্যোতির্বিদ।

—তিনি কি জন্মপত্রিকা করেন?

—কেউ ধরে পড়লে করেন।

—তাঁরে কি দিতে হবে?

জিভ কেটে মাথা নাড়ল গণপতি। বলল, না মহাশয়। তেমন মানুষ তিনি নন।

কনকা বলল, খুব জ্ঞানী-গুণী। ঘরে পুঁথির পর্বত বললে হয়।

গণপতি বলল, খুব বিদ্বান, আবার ফারসীও জানেন। এখন তো বাদশাহী নিয়মনীতি। জমিজমার ব্যাপারে আমিন কি বলে বুঝতে আমরা ওনার কাছে যাই।

—চল! তাই যাই। তোমাদের সমাজের মানুষদের নিয়েই চল।

—মধুকর, যদুনন্দন, গোপালদাস, এঁরাদেব ডাকলেই হবে। প্রতাপটা এঁদেরই বেশি।

এক সুদর্শন, গৌরবর্ণ প্রৌঢ়, তাঁর সঙ্গে দামিন্যার বেনে সমাজের ক'জন এঁদের আসতে দেখে মুকুন্দ বিস্মিত হল। বাড়ির বাইরের চালাতে সারি সারি কাষ্ঠাসন রাখাই থাকে, মানুষজন এলে বসে। অন্যসময়ে শিবরাম ও শিউলি এগুলির উপর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে।

মুকুন্দর বউ গভীর কৌতূহলে দরজার কপাটে ঘোমটা আড়াল দিয়ে দাঁড়ায়।

মুকুন্দ সবিস্ময়ে ওঁদের প্রণাম গ্রহণ করল। ওঁরাও মাটিতে কপাল ঠেকালেন। মুকুন্দ হাত তুলে আশীর্বাদ করল। বলল, বসুন সবাই। তা মধুকর! এঁকে তো চিনলাম না?

শচীপতি সনিশ্বাসে বললেন, আমি এক কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগ্য পিতা। অনেক অনেক রকম ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে মানুষ। কিন্তু ঠাকুর! এই একাদশ বঙ্গাব্দে, এই বাংলা সুবায় যার অনূঢ়া কন্যা আছে, তার মত হতভাগা কেউ নাই আর। সে জন্মাপরাধী সমাজের কাছে।....কন্যা বুঝি আপনার?

কোমরে এতটুকু লালগামছা লালসুতোয় বাঁধা, গলায় মাদুলি কোঁকড়া চুল আঁচড়ে তুলে চাঁদির ওপর ছোট্ট ঝুঁটি বাঁধা দুবছরের শিউলি রুপোর মল ঝমঝমিয়ে বাপের কোলে এসে বসল।

শচীপতির সপ্রশ্ন, তৃষ্ণার্ত চাহনি।

—আপনার....কন্যা?

অপ্রতিভ মুকুন্দ শিউলির মাথায় চুমো খেল, নামিয়ে দিল। বলল, শিবু! বোনরে নিয়ে যা। হ্যাঁ, এটি কন্যা।

তারপর শচীপতিকে বলল, ছোট্ট মানুষ, নাম চিত্রলেখা। আমার মা শিউলি বলে ডাকতেন। এই একটি মেয়ে আমার।

—আমারও ওই কোলের মেয়ে অহনা!

—অহন, দিবস, অহনা কে নাম দিল? এমন নাম তো শুনি নাই।

—রামাচার্য জ্যোতিষশাস্ত্রী!

—বিখ্যাত মানুষ।

—উনিই আমার বাড়ির সবকিছুতে....তা ঠাকুর! শচীপতি সকল কথাই বললেন। তারপর বললেন, মেয়ের জন্মপত্রিকাটি দেখে দিন ঠাকুর। যাতে এঁরাও জানেন, কেন মেয়েরে আগে বিবাহ দিইনি।

—নিশ্চয় দেখে দেব।

পড়তে পড়তে মুকুন্দ যেন পাথর হয়ে গেল। কপালে হাত রেখে চিন্তা করল।

—ঠাকুর!

—এরে অরজস্বলা বিয়ে দিলে এ বিধবা হত। আর এখন বিবাহ দিলে চিরায়ুষ্মতী হবে। পতিগৃহে সকল দিকে ভালো হবে। আর সপত্নী থাকবে এর তাও বলা আছে।

—তা হলে....

—জন্মপত্রিকার যেমন বলা আছে, আপনি তেমন কাজই করছেন।

—পুত্রবতী হবে কন্যা?

—লেখা আছে পুত্র ভাগ্যে যশোলাভ, শ্রীবৃদ্ধি। গণপতির কপাল খুব ভাল।

—আমার মেয়েরও! এমন গ্রাম! সজ্জনদের সমাজ। এত বিদ্বান, দেবাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ! বণিক সমাজের দুঃখ তো জানেন।

—আমি জানি, "বল্লালচরিত" পড়েছি।

—আমরা সে গ্রন্থ দেখিনি। কি লেখা আছে ঠাকুর?

—নয়শত বঙ্গাব্দে রচিত....একজন আগেই শুরু করেন, পরে আরেকজন সমাপ্ত করেন। এসব আমারও কথা নয়, পণ্ডিতরা যা বলেন....

—আমাদের কথা কি লেখা আছে?

—মোটামুটি যা জানা যায়....সুবর্ণবণিকরা সমাজে খুব উচ্চবর্ণই ছিলেন! তা....মহারাজা বল্লালসেন দরকার পড়লে তাঁদের কাছে ঋণও নিতেন। তা একবার বিপদকালে মহারাজ বল্লালসেন এক মস্ত ধনী সুবর্ণবণিকের কাছে অনেক সোনার টাকা ধার নেন। সে কোটি কোটি টাকা!

শচীপতির মনের চিন্তা ও দুঃখ যেন দূরে গেল। তিনি সবিস্ময়ে বললেন, কোটি কোটি টাকার সোনা!

মধুকর বলল, সে কত টাকা?

মুকুন্দ হেসে বলল, আমি কি করে জানব? আমার সম্পদ বলতে পুঁথিপত্র, আমার গৃহশান্তি।

—না ঠাকুর, আপনি বলুন।

—দ্বিতীয় বারও যখন টাকা চাইলেন, তখন সেই সুবর্ণবণিক বুঝি টাকার বদলে তালুক চেয়েছিলেন। রাজা ক্ষেপে যেয়ে…যেমন মনে পড়ছে…আপনাদের সমাজের উপর নানা অত্যাচার করেন, অনেক ধনরত্ন কেড়ে নেন।

—আহা! ঠাকুর শুনেও বুকে বল আসে যে এককালে আমাদের ঘরে ধনরত্ন থাকত। তারপর?

—আবার বল্লালসেন কৌশল করে এক নিমন্ত্রণ পাঠালেন, কিন্তু সৎশূদ্রদের সঙ্গে সুবর্ণবণিকদের একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা হল। এমন ব্যবস্থা হচ্ছে জানতে পেরে সুবর্ণবণিকরা এ নিমন্ত্রণে যাননি।

—তারপর?

—বল্লালসেন সুবর্ণবনিকদের শাস্তি দেবার অছিলা খুঁজছিলেন, পেয়েও গেলেন। তাবপরই তিনি সুবর্ণবণিকদের…সমাজে নামালেন, কৈবর্তদের উঠালেন তার উপরে…বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলছে ব্রাহ্মণের বাইরে যে সকল জাতি তাদের ধরুন তিন ভাগ। সুবর্ণবণিকদের জায়গা…নিচে নেমে গেল।

—একদিন উপরে ছিল?

—নিশ্চয়! গন্ধবনিকদের বাণিজ্যতরী দেশে দেশে যেত। সোনা, রূপা, মণিমুক্তা, হীরার ব্যবসা আপনারাই করতেন। এমন সুবর্ণবনিক ছিলেন যে ব্রাহ্মণদের গরু দিতেন না, স্বর্ণগাভী দান করতেন।

শচীপতি বললেন, চাঁদ বেনে, ধনপতি সওদাগর, এ সব তবে উপাখ্যান মাত্র নয়?

—উপাখ্যানের পিছনে উপাখ্যান থাকে। চাঁদ পূজা না করলে মনসা পূজা পেতেন কি? আর মঙ্গলচণ্ডীর ঘটপূজা…তারও তো কাহিনী আছে।

শচীপতি বললেন, কেমন সব লোক সমাজে ছিল! আর আজ আমরা সব ভুলে এ-ওরে দংশে বেড়াই। তাহলে…ঠাকুরমশাই! বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, একথা সত্য ছিল?

—নিশ্চয় ছিল। পুঁথির লেখা কি মিথ্যা হতে পারে?

—ধন্য দামিন্যর বেনেসমাজ! অবহেলে আপনার দর্শন পায়। আমি তো ধন্য হলাম! আর না। আজ্ঞা দেন, উঠি।

শিবরাম এসে বলল, বাবা! প্রেসাদ দিচ্ছে মা!

মুকুন্দ ভিতরে যেয়ে কাঠের বারকোস বয়ে আনল, আর কলাপাতা খণ্ড খণ্ড করে তাতে সাজানো ফলমূল, ক্ষীরের সণ্ড সকলকে আলগোছে হাতে দিল।

বাগাল হলধর জলের ঝারি আনল। প্রসাদ খেয়ে জল পান করে শচীপতিরা আবার মাটিতে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। শচীপতির অন্তরটি খুব পরিপূর্ণ। এক দুঃখ মনে নিয়ে এসেছিলেন, অন্য ভাবে শান্তি পেয়ে গেলেন যেন।

যেতে যেতে বললেন, ঐশ্বর্যে কি করে। বিদ্বান, পণ্ডিত, এঁরা হলেন দেবতুল্য।

যদুনন্দন বলল, এঁদের বংশই বিদ্বানের। আর ঠাকুরের মা যিনি ছিলেন তাঁর কথা কি মিষ্টি না ছিল। পাথরের ঘটিতে যেন চিনির পানা!

গণপতি বলল, আমার ঘর পাড়ার প্রান্তে, ঠাকুরদের পাড়া ওনার ঘর দিয়ে শুরু। কোনদিন ও বাড়ির কারো উঁচু গলা শুনলাম না।

শচীপতি বললেন, আমি এখন যাব। তা হলে আমি যেয়ে আয়োজন করি?

যদুনন্দন, দামিন্যার বেনে সমাজের মাথা সুনন্দনের ছেলে। কখনো বাবা আসেন, কখনো ছেলে। সে বলল, তাতে আর কথা কি? শুভকাজে আর বিলম্ব কেন!

গণপতি যেন ভারি নিশ্চিন্ত হল।

রাতে বউ বলল, ওনাকে যে সব কথা বললে, তা কি সত্য ?

—গ্রন্থে তো তাই লেখা আছে।

—কি সুন্দর চেহারা।

—ভদ্রলোক বড়ই মনস্তাপে ছিলেন। মেয়ের বাবা তো! মেয়েটির জন্মপত্রিকাও কিছু অদ্ভুত। তা…ওঁর মনে কিছু শান্তি দিতে পারলাম। তাপিতজনকে সান্ত্বনা দিতে হলে মিথ্যাভাষণেও দোষ নেই।

—মেয়েটা সুখী হবে তো ?

মুকুন্দ বিষণ্ণ হেসে বলল, যেমন আর পাঁচটা মেয়ে হয়, তেমন হবে ?

—এঁকে দেখলে আর গণপতিকে দেখলে…

—ছাড় তো ও সব কথা।

—শিউলিকেও তো বিয়ে দেব একদিন।

মুকুন্দ সাদরে বলল, বাপ যেমন সুখী হয়েছে, তেমন সুখীই হবে। মা যেমন সুখী হয়েছে, শিউলিও তাই হবে।

—ও মা! কথা শুনেছ ?

—কি কথা ?

—কোথা নাকি সাপে…ছি ছি! আস্তিক আস্তিক! গরুড় গরুড়! লতা এসে কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। সে ছেলে মায়ের দুধ খায় না।

—তোমার মোহনের মার গল্প তো ?

—হ্যাঁ গো!

—বুঝেছি। বেশ তেল ভরে বড় পিদিমটা জ্বালো দেখি ?

—জ্বালছি।

—তুমি যখন…আলো জ্বালো…আমার দেখতে বড় ভাল লাগে বউ!

বউ সহাস্যে পিদিম ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ৭ ॥

এরপরে আর কিছুই থেমে থাকল না। বাবা আর মার কথাবার্তা শুনে অহনা যেমন নতুন অচেনা, ধরাছোঁয়ার বাইরে হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি রইল সে।

যে যা বলে, একটু হেসে জবাব দেয়। আসল প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

মা কি করবেন?

—চল্ অহনা হলুদে খৈল ঘষে স্নান করিয়ে দিই।

—এত বড় মেয়েরে কেউ স্নান করায়?

—কত বড় হলি তুই?

—অনেক।

অহনা কি সেই অহনা?

—দেখ্ দেখ্, কেমন শাড়ি এনেছেন বাবা।

—দেখি? বেশ শাড়ি।

খুব সহজ সে, সব কাজকর্ম করে। আর থেকে থেকে কাঁথাটি সিঁয়াতে বসে।

—কেন চোখ বিন্ধে সিঁয়াস মা?

—কাঁথাটি···কবে ধরেছিলাম বল? আর তো একটু বাকি। তুমি হিমের কালে গায়ে দিও?

—তাদেরও কাঁথা সিঁয়ে দিস।

—তাদের? দেব।

আইবুড়ো ভাত খেতে ডাকে পাড়ায়। অহনাকে সবাই ভালবাসে। এর ছেলে ভোলাত, ওর চাল বেছে দিত, তার বাড়ি শাক বেছে দিত। ঘরেদোরে নেপটে থাকা মেয়ে।

নন্দরানীর বাড়ি খেতে খেতে অহনা বলল, আইবুড়ো ভাত কেন খাওয়ায় বলত?

—কেন আবার, নিয়ম ?

—হ্যাঁ বউঠান, সব নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। এই যে আইবুড়ো ভাত দেয়, এর মানে হল, পরের ঘরে গেলে তো আর আসা হয় না! তাই!

—কেন রে ? আমি যাই না বাপের বাড়ি ?

—তুমি যাও, আমার ভাজ যায়, কিন্তু তেমন তো আর যায় না সবাই। ত্রিনয়নী হতে বল ? কুন্দ, মুক্তামালা, গোপালী, পদ্মমুখী, যারা একসঙ্গে খেলতাম, কই, সবাই তো শ্বশুরঘরে। কেউ আসে ?

—শ্বশুরঘরে মন বসেছে তাদের।

—না গো! সেথা তাদের নিয়মে চলতে হয়। তাই আসে না।

—তোর কি মনে দুঃখ, অহনা ?

—কেন ? এই তো কেমন খাচ্ছি।

—এই বিয়ে হচ্ছে বলে দুঃখ ?

—না বউঠান, কোন দুঃখ নাই। আমার কোষ্ঠীতে যা আছে তাই তো হবে। তুমি তো তোমার ভাজ করতে চেয়েছিলে, পারলে ? রজঃস্বলা মেয়ের বিয়ে হয় না বউঠান! আকন্দ পিসিকে দেখনি ? দশ বছরেই যা হবার হয়ে গেল, তার বিয়েই হল না। সেই থেকে বাপের ঘরে, এখন ভাইয়ের ঘরে দাসী হয়ে আছে। দামিন্যার এরা তো ভাল বলতে হবে। জেনেশুনে আমায় নিচ্ছে।

নন্দরানী অহনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

—কেমন করে কথা বলছিস অহনা ? যেন অনেক দূরে চলে যাচ্ছিস ?

—কাঁদ কেন ? ভাত হাতে কাঁদে কেউ ?

—খুড়া তোরে ঠিক নিয়ে আসবেন।

—তাঁর কথা সতীন শুনবে কেন ?

—শুনবে, শুনবে। কে কবে শুনেছে সতীনকে একপ্রস্থ গয়না, অমন রাঙাপেড়ে দুধ গরদ, ডালা সাজিয়ে আলতা সিঁদুর চিরুনী মাথার তেল, সব্যস্ব দেয় ?

—সতীন ঘরে দিলে দিতেই হবে।

—ভাল হয়ে থাকিস। স্বামী তোরে খুব ভালবাসবে।

—ভাল হয়ে থাকব মানে? ওরা যেমন রাখবে তেমন থাকব। পদ্মমুখীকে নিয়ে গিয়ে ওরা তো পদ্মর সতীনকে গোহালের কোণে শুতে দেয় এখন, নয়তো ঢেঁকিশালে। সে বা কি করবে? যেমন রাখবে, তেমন থাকবে।

—কেন, তোর মা পরের ঘর করে নি? আমি করছি না?

অহনা ক্লান্ত স্বরে বলল, অনেক মেয়েরে অনেক দুঃখ দেয় বিধাতা! মাঝে মাঝে দু'এক জনরে সুখ দেয়। সকল মেয়েরে যদি দুঃখের সঙ্গে সুখও দিত! সে বোধহয় নিয়ম নাই।

—তুই বদলে গেছিস খুব।

—না না। আগে ভাবতাম না, এখন ভাবি। আগে বুঝি নাই, এখন বুঝি, মা, বাবা বড় অন্যায় করেছে গো।

—কেন?

অহনা এঁটো হাতে দেয়ালে হেলান দেয়। ঈষৎ হেসে বলে, হেঁটে গেলে বুক পেতে দিয়েছে, দুধের চাঁছি, ক্ষীরের সর আমার জন্যে তোলা থাকত। নীল রং ভালবাসি, বাবা চিরকাল নীল শাড়ি বুনিয়ে এনেছে। ভিখিরি এলে নতুন কাপড়, ধামা ভরা চাল দেই, দিতে দিয়েছে। দাদার পড়া দেখে জেদ করেছি, পড়তে শিখিয়েছে। তারা আমাকে সে ভাবে থাকতে দেবে?

—ভয় পাস না লক্ষ্মীটি!

—ভয় কিসের? আমি ভাবছিই না কিছু।

—স্বামী খুব ভালবাসবে।

—আর ছেলে না হলে আরেকটা অহনা আনবে, তার তো ছেলে চাই। তার ছেলে চাই, সতীনের দাসী চাই···এই দেখ! আবার কাঁদে। কেঁদ না বউঠান! আমি হাসিমুখে যাব, হাসি মুখে থাকব।

—যেয়ে দেখে আসব।

—কোনদিন কারো মন রেখে চলি নি। আমার মন সবাই রেখেছে। এখন আমি শ্বশুরবাড়ির বিড়ালটারও মন রেখে চলব। সত্যি! ভাবতে গেলে হাসি পায়।

—এখনো কি···

—না বউঠান! আমারে পার না করলে বাবার নাকি অনন্ত নরকবাস হবে. নিয়ম! তাই ভাবি, ডোম-ডোমনী. জেলে-জেলেনী. বেদে-বেদেনী, সাপুড়ে, বাজিকর, এরা বেশ আছে। দুধের মেয়ের বিয়ে নেই। স্বামী-স্ত্রী পথেঘাটে কেমন ফিরে, কোন নিন্দা হয় না। মেয়েরা, যাকে মন লয়, তার গলেই মালা দেয়। বিধাতা জানে না, নিয়ম জানে না, বেশ থাকে! নাও, ওঠো. বাড়ি যাব. ঘুম ধরেছে আমার।

দিনে দিনে বিয়ের দিন এল।

এ সময়ে অহনার মা শুধু রতি হাড়িনীর সন্ধানে যান। কলা-বাগানে চুপে চুপে বলেন. তোর ব্যাগ্যতা করি রতি! এমন অষুদ দে. যাতে জামাই অহনার বশে থাকে। বড় বেপাকে পড়ে সোনার পুতলী সতীনঘরে দিচ্ছি মা! তোরে নতুন কাপড় দিব. সোনার মাকড়ি।

রতি হাড়িনীর চোখ "সোনার মাকড়ি" শুনে উজ্জ্বল হয়। তার পরনে হাঁটু অবধি গোড়ে কাপড়. রুক্ষ চুলে ঝুঁটি, চেহারা বেঁটেখাট. বলিষ্ঠ। যেহেতু অষুদ-বাকল-মন্ত্র-বশীকরণ-বানমারা তার পেশা, সেহেতু ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ তাকে ভয় পায়। স্বচ্ছন্দে সে সকলের বাগান ঢোকায়. ফলপাকুড়-কলাপাতা-মোচা ইত্যাদি নেয়। গৃহস্থ বলে. পাখিতে বাদুড়ে কি খায় না? রতি নিল তো কি হল?

নিশা জাগরণে. তাড়িসেবনে ও তার প্রাচীন নাগর কান্ত রজকের মৃত্যুতে রতি বড়ই কাতর এখন। নিজের দুঃখে যত কাতর. অন্য রমণীদের দুঃখেও। সে বলে, আর মাকড়ি গো মা! আমার অমন মানুষ বেসজ্জন গেল!

—কাজটা করে দে মা?

—বলছ. সতীন ঘরে দিচ্ছ!

—হ্যাঁ রে····

—বুঝলাম! তা সতীনের ছেলে আছে?

—না, আটকুঁড়ী।

—তাতেই দিদিরে নেচ্ছে! বুঝলাম। সতীন কাঁটা মেরে দেব?

—না না রতি! ওকথা মুখে আনিস না।

রতি নিস্পৃহ ভাবে বলে, শুগনো ওটোনে উচট খেয়ে মরে যেত, দিদি একেশ্বরী হয়ে থাকত! তা, সতীন সোয়ামির চক্ষে বিষ হবে, সোয়ামি দিদির বশ হবে, এই তো?

—এটুকু হলেই মা····

—আজ সোমবার। কাল মঙ্গলবার দিদির বাসি কাপড় থে' একটা সুতো, চিরুনি থে' একটা চুল, খোঁপার কাঁটা একটা হেথা এনে দে' যেও। অমুনি একটা সিদে!

—সব আনব।

বড় আর্তিপিতি সব জোগাড় করেন অহনার মা, কাঠের বড় বার-কোশে চাল, বড়ি, তরকারি, তেলের ভাঁড়, লবণ, মশলা আনেন। রতি বলে, রাঁদতে মন চায় না গো! কিন্তু দেহ যন্তরটি তো চালাতে হবে।

—মাছ দেব?

—না না মা! বে' হয়নি। কিন্তুক মনে মনে····একমাস এখন নিরিমিষ্যি····

রতি চলে যায়। আহা! মাছ-কাঁকড়া-মাংস খেতে কান্ত কত ভালবাসত। বিপত্নীক, অপুত্রক কান্তর জন্যে এটুকু সে করবে না? সবাই জানত বহু বছর কান্ত কোন জাতবৃত্তি করে না, রতির ঘরেই থাকে।

রতির অলৌকিক শক্তিতে দখল আছে জেনে কেউ কিছু বলত না।

অহনার মা'র মনটি কিছু হালকা হয়।

শনিবারে একটি ছোট লাল বস্ত্রখণ্ডে কি যেন বেঁধে আনে রতি! বলে, মঙ্গলবার হতে খালি দৌড়াই আর দৌড়াই'

—এনেছিস ?

—হ্যাঁ মা ! সকল দিক ভাবতে হবে তো ! বলছ সতীন আছে। সে সদাসব্যদা চক্ষু রাখবে দিদি কি করে ! তাতেই এমন অষুদ দিলাম না যা স্বামীরে শুকাবে, কি বেটে খাওয়াবে। সহ-বশীকরণ হোম করে শেওড়া ডালের আগুনে সব আউতি দিয়ে…এই পুঁটলি সিঁয়ায়ে দিলাম। জামাইয়ের যে বালিশ দিবে, তার মাঝে ঠেসে মুখ সিঁইয়ে দিও।

—কাজ হবে তো ?

—না হলে হেথা আমি ঘুরতে ঘুরতে এসে তোমার এই কলা-বাগানে মুখে রক্ত তুলে মরে যাব। আরো প্রমাণ চাও ?

—না মা ! এই লও মাকড়ি। মেয়ে যেন পাষাণ হয়ে আছে গো…

—সতীন ভয় কি কম ভয় ? ভয়ে দিদি আটাশ লেগে আছে বই তো নয় ! কেটে যাবে।

অহনার মা পুঁটলিটি খোঁপায় গুঁজলেন। সত্যিই তো, বেটে-বুটে খাওয়ালে ছলা ধরবে, বিষ দিয়েছে।

বড় নিশ্চিন্ত হয়ে অহনার মা বিয়ের জোগাড়ে গেলেন। বিয়ের জোগাড়টি তো কম নয়।

সবই করে গেল অহনা, যে যা বলে ! আর বিয়ের দিন নতুন চেলি পরে গয়নায় সেজে নতুন মাদুরে বসে রইল।

নন্দরানীরা ফুলের বাসর সাজাচ্ছিল। পালঙ্কে ফুলের বিছানা, মালাকর ফুলের বালিশ, তাকিয়া, সব করে নিজের কারিগরি বিদ্যা দেখিয়েছে। শোলার চাঁদমালা ও অভ্রের মালায় ঘর ঝলমলে।

নন্দরানী এসে পাশে বসল।

—তোকে চেনা যাচ্ছে না।

—দেয়ালে হেলান দেই বউঠান, পিঠ কোমর ধরে গেছে. দেব ?

—দে না। ঘামছিস কেন ?

—আমার ভয় করছে।

—ভয় কি ? বিয়ে সবার হয়।

—ভয় করছে।

—আজ তো বাসর····

—তোমরা সবাই থাকবে তো ?

—নিশ্চয়।

অহনা চোখ বুজল। বেহুলা লখীন্দরের উপাখ্যান! বাসর-রাতে বর বউ একত্র থাকে না। যদি থাকে, রাত পোহালে কন্যা বিধবা হয়।

কিন্তু শ্বশুরঘরে গিয়ে .

বর এসে গেল।

দামিন্যাতে এমন জাঁকজমকে কোন বউ আসে নি শ্বশুর ঘরে। সুসজ্জিত পালকিতে বর বউ, গরুর গাড়ির পর গরুর গাড়িতে বিছানা, বাসন, কাপড়ের পেটারি। ভারে ভারে বাঁকে বহে কত না মাছ-দই-ক্ষীর-মিষ্টান্ন-ফল-ঘি-তরকারি, মশলা, গন্ধদ্রব্য, সমাজের আয়তিদের জন্যে রুপোর সিঁদুরকৌটো, আলতা, চিরুনি।

ভিড় করে দাঁড়িয়ে সবাই অবাক হয়ে দেখল অহনার রূপ। শান্ত, ধীর, অপরূপ সুন্দরী অহনা।

কনকা সগর্বে সবার দিকে চাইছিল। যেন বিসর্জন প্রাক্কালে প্রতিমাকে যেমন দেখায়, তেমনি বিষণ্ণ, স্তব্ধ, অপরূপা সুন্দরী সতীন, এ যৌতুকসম্ভার, এ জাঁকজমকের কৃতিত্ব তার একার।

কনকা এগিয়ে এসে বরণ করল।

—এসো বোন এসো। আমি তোমার দিদি!

অহনা প্রণাম করল।

ফুলশয্যার রাতে আড়ি পাতেনি কেউ। অহনা পালঙ্কে বসেছিল স্বামীর অপেক্ষায়। এ রাতে যে কি হয়, তা নিয়ে অনেকে অনেক ঠাট্টা করে গেছে। অহনা সমিনতি চোখ তুলে নীরবে বলেছে, চুপ

করো। কনকার হাত চেপে ধরেছে বারবার।

—ভয় করছে দিদি।

—ভয় কি বোন ?

রাত কেটে গেলে বিশ্রস্ত, মনে ক্ষতবিক্ষত, অহনা বেরিয়ে এল সন্তর্পণে। পালঙ্কে তৃপ্ত গণপতি ঘুমোচ্ছে।

অহনা দালানে বসল। এইজন্যই বিয়ে হয়, এরই নাম বিয়ে। এখন থেকে প্রতি রাতই এভাবে কাটবে, অহনার নিয়তি যা ঠিক করে দিয়েছে।

—উঠে এলি কখন, বোন ?

—অনেকক্ষণ দিদি !

—তা···কাটল কেমন ?

কনকার মনের ঈর্ষা তীক্ষ্ম হতে পেল না, কেন না অহনা ওর কোলে মাথা গুঁজে নীরব কান্নায় কনকার কোল ভিজিয়ে দিল।

হায় ! কাকে ঈর্ষা করবে কনকা ? কাকে ভেবেছিল সা'জোয়ান, কনকার সিংহাসন কেড়ে নিতে এসেছে ? এতো ভীরু, কাতর এক ব্যালিকা।

কনকা হাত বুলিয়ে চলল অহনার মাথায়।

॥ ৮ ॥

অহনার বাড়ি থেকে যে দাসী এসেছিল, অষ্টমঙ্গলবার দিনে সে বরকনের সঙ্গে গেল ত্রিনয়নী। বরকনে তো তিনদিনের দিন ফিরেই যাবে, সে আর ফিরবে না।

অহনার মাকে বলল, কোনো দরকার নেই মা ! সতীন তো মা হয়ে দিদিরে যত্ন করে খাওয়ায়, মাথায়, জল গড়াতে দেয় মা।

—সত্যি বলছিস ?

—নয় তো কি ? আর ওদের দাসীও আছে, এক বিধবা পিসি

আছে, গিন্নি নিজেও দশভুজা হয়ে খাটে। কোন কষ্ট হবে না দিদির।

—না হলেই ভাল। এখন তো একবছর আনা যাবে না, নিয়ম নেই।

—ভালই থাকবে।

অহনা বাপের বাড়ি এসেও তেমনি নীরব।

—সতীন কেমন, অহনা ?

—কেন, ভাল ?

—ওখানে থাকতে কেমন লাগছে ?

—ভাল।

—একবছর তো আনা যাবে না।

—কেন, নিয়ম ?

—হ্যাঁ মা, নিয়ম।

নন্দরানীর শাশুড়ি বললেন, নিয়ম কি আর এমনি এমনি হয় মা ? সেখানে টানা থাকলে তবে তো মন বসবে। পোয়াতি হও, বাপ নিয়ে আসবে।

অহনা ঈষৎ হেসে বলল, দিদি বড় অভাগী গো। তারে কেউ বাপের বাড়ি আর নেয়নি।

—তোরে ভালবাসে ?

—হ্যাঁ, যথেষ্ট।

—আর জামাই ?

—কেমন করে জানব ? আমি তো "হ্যাঁ", "না" ভিন্ন কথা বলি না।

শচীপতিও মেয়ের কাছে "হ্যাঁ", "না" এর বেশি কথা শুনলেন না।

ক্ষেমংকরের বউ, নন্দরানী, এদের শত কথাতেও অহনা তেমন সাড়া দিল না।

ভাজ বলল, ঠাকুরঝি কিছু বলছেই না।

অহনা বলল, বলার কি আছে বউঠান ?

অহনার দাদা ক্ষেমঙ্করের বউ কুমুদিনী তরল স্বভাবা, তার দেহে অকাল যৌবন, ভরা কলসের মত সে উথলে উথলে পড়ে।

সে বলল, সে কি গো ? এ হল রসের সময় ! ঠাকুরজামাইয়ের যেন নবযৌবন ! টগবগ করছে।

—তা হবে।

—বর পছন্দ হয়নি ?

—না হলে চলবে কেন ?

—সতীন না কি····

—যথেষ্ট স্নেহ করে।

—তা হলেও ভাই সতীন বলে কথা !

—আমাকে তো ওকে নিয়েই থাকতে হবে ! আর ওখানেই থাকতে হবে ।

—তবে কথা বলে কি লাভ ভাই। এক বছর তো দেখা হবে না।

অহনা বলল, নিয়ম ! তবে তোমার বাপ ভাই তো এসেছেন ভাই।

নন্দরানী বলল, শ্বশুরবাড়ি যেমন রাখবে, তেমনই থাকতে হবে। চল্ অহনা, আমাদের বাড়ী চল্।

—মায়ের কাছেই থাকি। তিন দিনের মেয়াদ তো, নিমেষে ফুরাবে।

নন্দরানীর মনে হল কোথায় যেন কি ভুল হয়ে গেছে। নইলে অহনা এত পালটে যায় ?

সতীন নাকি যত্ন করে, খুব যত্ন করে।

—সত্যি, এমন যত্ন করে সতীন, কে জানত ? অহনা লো, তোর কপাল ভাল।

—মা বলে, দিদির চরণ ধরে থাকবি।

কনক বলল, থাক ! চুল মুছে দি', জল শুকাই। দুপুরে বিলি কেটে শুকিয়ে দেব।

—কাপড় ছাড়ি, দিদি ?

—ছাড়ো।

অহনা ঘাটে উঠল।

সরস্বতী বলল, রাঁধতে তো দিস না ওরে।

—যতদিন পারি, করি। রাঁধতে দিই না। কিন্তু কুটে, বেটে, ধুয়ে, মশলা করে, জোগাড়টি ও দেয়। আমি শুধু হাতাখুন্তি নাড়ি।

—যাই দিদি ?

—যা, আমি আসছি।

অহনা চলে গেল।

সরস্বতী বলল, হেঁসেলটি ছাড়িস নি সই।

—না না, তাই ছাড়ি ?

—রাজকন্যের মাট্যাঘর পছন্দ হচ্ছে ?

—হতেই হবে।

—তুই যেন সব খাটনি একা খাটিস না।

কনকা ভ্রূ কুঁচকে বলল, তা খাটি না। অহনা বামীর মা'র হাত থে' নেতা কেড়ে নে' লেপবে, মাদুর বিছানা রোদে দেবে, না, শিক্ষা ভাল। বসে থাকতে শেখে নি।

কনকা যখন এল, তখন অহনা পুজোর জোগাড় করছে।

—এই দেখ! তুই কি বসে থাকতে জানিস না ?

—না দিদি, এই ক'টা তো!

—বাপের বাড়ি মাজতিস ?

—কে মাজবে ?

—খুব খাটতে শিখিয়েছে মামী।

—তা বলতে পার। অ দিদি, কাপড় আমি মেলে দেব গো, তুমি চুল আঁচড়াও।

—পিসি কোথা গো ? একবার বলো ভাইপোকে, মশলা পাঠিয়ে দেয় যেন। হ্যাঁ অহনা, জল খেতে দিয়েছিস ওকে ?

অহনা সবেগে মাথা নাড়ল, তুমি দাও।

—তুই একদিন দিলি, আমি একদিন!

—তুমি দাও দিদি।

কনকাও তাই চায়। জলখাবার নিয়ে সে গেল। গণপতি গুম হয়ে বসে আছে।

—আমারে দেখে নিরাশ হলে? মুখ অমন থমথমে কেন?

—না…থমথমে কেন হবে?

কনকা সামনে বসল। বলল, কেমন হল নতুন বউ? যত্নআত্তি করে?

গণপতি বলল, কাঠের পুতুল যত্নআত্তি করবে কি? বিছানায় পড়ে থাকে যেন কাঠের পুতুল!

—সবাই কি একরকম হবে?

—তোমার যদি কোলে একটা হত….

কনকা নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, বাপের বাড়ি খুব ছায়ায় মায়ায় ছিল তো! এত বড়টা অব্দি সেখানে, সহজ হতে সময় লাগবে।

—কাজকর্মে তো খুব ফুর্তি দেখি।

—হ্যাঁ, তা আছে।

—রাঁধতে বাড়তে দাও না কেন? সেই যদি আগুন আঁচে পুড়বে, আর কাঠের ধোঁয়ায় চোখ মুছবে, তাহলে ওকে আনলাম কেন?

কনকা কি করে বলে, কর্ত্রীত্বের দখল রাখতে হেঁসেলটি দরকার? হেঁসেল আর ভাঁড়ার, এ দুই ছাড়লে তো সংসারে তুমি গৌণ হয়ে গেলে। বলল, যতদিন পারি যত্ন করি। তারপর ক্রমে ক্রমে….

—হ্যাঁ, কচি খুকিটি! মা ছেড়ে এসে দিদি পেয়েছে। যার জন্যে পেল, তারে দেখেই আটশ!

—বেটাছেলের ধৈর্য সহ্য থাকে না কেন? টেনে টেনে পদ্মকুঁড়ি খুলে দিতে পার। সে কেমন দেখতে, আর জলে যে পদ্ম আপনা

হতে ফোটে, সে কেমন ?

—যাক্ ! আমি যাই। মসলাপাতি কি বলছিলে ?

—তত্ত্বতাবাসে এসেছিল, বলিনি। এখন তো আনা দরকার।

—হ্যাঁ, আমি মশলাই আনি, তুমি উনোন জেবলে আরো রাঁধ। আরো রাঁধ।

—বেশ বাবা বেশ ! একদিন বলব রাঁধতে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া মিটলে কনকা অহনাকে বলল, মাদুর পেতে গড়া খানিক।

—তুমি শোবে না ?

—না। সুপুরি কাটি।

—আমি কাটছি।

—নে, কাট।

বসে বসে খানিক সময় গেল। কনকা, 'বলব কি বলব না' ভেবে ভেবে বলল, অহনা, একটা সত্যি কথা বল্ তো ?

—কি দিদি ?

—তোর কি বর মনে ধরেনি ?

—ছি দিদি ! এ কেমন কথা ? এ কথা কেন বললে হঠাৎ ?

—কি বলব ! আমি তো রোজই তোরে ঘর ছেড়ে দিতে চাই।

—মা বলেছেন, তা হয় না।

—কিন্তু কেন হয় না ?

অহনা চোখ নামিয়ে বলল, তোমার দাবী আগে দিদি ! তুমি যেমন বলো, তাই করি আমি।

—ওরে কি তুই ভয় পাস ?

অহনা নীরব।

—স্বামী হল জীয়নকাঠি। স্বামী নইলে জীবন বৃথা। মা তোরে এত শিখিয়েছে, এ কথা শিখায়নি ? অহনা নিষ্পাপ চোখ তুলে বলল, বলো কি করব। আমি কি জানি বলো ?

—খানিক সহজ হবি। পুরুষ মানুষ যা চায়····

ভালবাসা....

অহনা বলল, দেখব দিদি !

একবার মনে হল, গণপতি তো তার প্রাপ্য আদায় করেই নেয়। পুরুষমানুষ আর কি চায় ?

—কাল তুই রাঁধবি, জানলি ?

—তুমি তো রাঁধতে দাও না।

—কাল রাঁধবি। আর ঘরে যখন পাঠাব, তখন পরশু সকালে যেন ওর মুখে হাসি দেখি।

—হ্যাঁ দিদি !

—নে এখন শো'।

বিকালে কাপড় কাচতে গিয়ে কনকা সরস্বতীকে বলল, তুই বললি তেগুণারে দিয়ে অষুদ করলাম। যা চেয়েছিলাম তা তো হল না ?

—কেন গঙ্গাজল ?

—ভেবেছিলাম, স্বামী ওরে বিষনজরে দেখবে, ও কেন্দে মরবে। তা তো হল না। স্বামী ওরে চায়, ও যেন গাছ, না পাথর !

—তুমিও যেমন ! আড়ি পেতে শুনেছ ?

—শুনি তো। কোন কথা নয়, হাসি নয়, যেন মানুষ নাই ঘরে।

—সয়া তো চাইবেই। নব যুবতী, তায় অমন রূপ ! এর কি মনে ধরেনি ?

—কি জানি। তবে এ অষুদেরই গুণ !

—জানি না ভাই। আজ তোমার সয়া বললে, এ কথা রোজই বলে, রাজকন্যে কি রাঁধতে জানে না ? তুমি আগুন আঁচে কত পুড়বে ?

—দিস মাঝে মধ্যে।

—দেব। আর কি বোন....অহনা এত বীতরাগ হয়ে থাকলে তোর সয়া না ক্ষেপে যায়।

—তুইও যেন হাবাটা ! ঘি আর আগুন ! অহনার মন গলবে না তো কি। আমি ভাবি তোর কথা। তখন যদি আমে দুধে মিশে যায়, তুই আঁটি, পড়ে থাকবি।

—দেখা যাবে।

পরদিন গৃহদেবতা প্রণাম করে, কনকাকে প্রণাম করে অহনা হেঁসেলে গেল। মাছে নিরামিষে পাঁচ ব্যঞ্জন, পিঠে-পায়েস-অম্বল। কনকা বারবার বলল, পারবি তো ?

—ওখানে তো রাঁধতাম। আমি দু'এক পদ না রাঁধলে বাবা খেতেন না।

আতাপিসি বলল, বড়লোকের বিটিকে রাঁধতে দিলি বউ ? ঘি-তেলের শ্রাদ্ধ করবে।

—করুক না। একজনের আক্কেল হোক।

—এতকাল তোর হাতে খেল, এখনি একেবারে অসহ্য হল ?

—থাক পিসি। অশান্তি কর না।

—আমি বলার কে। তবে তোর কথাই ভাবি। আজ হেঁসেল, কাল ভাঁড়ার ক্রমে ক্রমে....আচ্ছা। তোকে তো জোগাড় দিতেও বলল না ?

—করুক না। দেখাই যাক।

কনকা ভেবেছিল, গণপতি খেয়ে ছি ছি করবে। আরো ভেবেছিল, আমাকে দেখেই বুঝবে, আজ আমি রাঁধিনি। বলতে কি, পাট ভেঙে শাড়ি পড়েছিল, চুল শুকিয়ে নিয়ে এলো খোঁপা বেঁধেছিল, পায়ে আলতা পরেছিল।

গণপতি কি জানবে, কোন কথায় কনকার বুকে কাঁটা বিধবে ? কোনো কোনো কাঁটা একবার বিধলে তা আর তুলে ফেলা যায় না। তা রক্তাক্ত করে হৃদয়কে, আরো বিঁধে যায়। গণপতি সোদ মানুষ, হট্টাকট্টা স্বভাব।

কনকা জল ছিটে দিয়ে পিঁড়ি পেতে দিল।

থালা সাজিয়ে আনল।

—কে রাঁধল ?

—কে রাঁধে ?

—তোমাকে যত বলি····

—নাও, আজ অহনা রেঁধেছে।

—বললাম বলে হেঁসেলে দিলে ? খাওয়া যাবে তো ?

—কেন খাওয়া যাবে না ?

এত তৃপ্তি করে, এতবার চেয়ে চেয়ে খেল গণপতি, যে কনকার মনে হল লবন ছিটিয়ে বিস্বাদ করে দিইনি কেন !

আবার গণপতি যখন বলল, তোমারটা দেখে দেখে শিখেছে ভাল। তবে সুক্তো তোমার মত হয়নি।

আবার কনকার মন প্রসন্ন হল। বলল, শিখবে, ধীরে ধীরে হবে।

—এখন থেকে····মাঝে মাঝে দিও····আগুনে ঝলসে তোমার মুখ যে····

—থাক ! কোন বয়সে হেঁসেলে ঢুকেছি····

নিরিমিষ ব্যঞ্জন অহনা পিসির জন্যে সরিয়েই রেখেছিল। পিসি নিজের ভাতটা ফুটিয়ে নেয়, ব্যঞ্জন কনকা দেয়। খেতে খেতে পিসি মনে মনে বলল, নতুন বউ রাঁধতে জানে বটে ! আর কেমন গুছিয়ে দিয়েছে। বড় বউ পাঁচটা রাঁধলে তিনটে দেয়। যদি বলি, অ বউ ! শাকঘণ্ট করলে যে ? লাউ ছেঁচকি ?—অমনি বলবে, ছোঁয়ানো হয়ে গেছে পিসি ! বড়ঘরের মেয়ের মনটাও বড় হয়।

কনকা আর অহনা খেতে বসল। সুক্তো মুখে দিয়েই কনকা বুঝল, গণপতি তার মন রেখে কথা বলেছে। কনকা এমন সুক্তো রাঁধতে পারত না।

অহনা গভীর প্রত্যাশায় বলল, দিদি ! লবণ-মসলা ঠিক হয়েছে ?

—হ্যাঁ অহনা, বেশ হয়েছে।

কনকার মনে এখন মেঘ। এমন রাঁধে যে মেয়ে, স্বামী তো

তার বশ হবেই।

অহনা বলল, তুমি কেমন করে মোচা রাঁধ দিদি, শিখিয়ে দেবে?

—ভাল লাগে?

—খুব। আর তিলবাটা দিয়ে লাউ···কনকার মনের মেঘ সরে গেল। সে বলল, ধীরে আস্তে হবে বোন! আমার দশ না পুরতে বিয়ে! দশদিন বাদে থেকে হেঁসেল! শাশুড়ির ঘর তো করলে না, ভাগ্যি তোমার! দশ পদ রাঁধব, পেট কাঁদিয়ে খেতে দিত। খুব, খুব কষ্ট দিয়েছে তার রাজত্বিকালে।

—মা গো। মা তো আমার ভাজকে····

কনকা গভীর সন্তোষে বলল, শোধ আমিও নিইছি। শেষে তো আমার গলায় পড়িছিল। ভাসুররা সরে গেল, বুড়ীও শোথে-জ্বরে-বাতে, শেষে রক্ত অতিসার না কি হয়ে···কত পারব বল্? খুব কষ্টই দিইছি।

কনকার কথা শুনে, মুখ দেখে অহনার বুকে যেন পাষাণ মারল কে। বোকার মত ও বলল, কিন্তু দিদি! গুরুজন····

কনকা মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল, যেমন দেবে, তেমন পাবে না? যখন ক্ষ্যাম্তা ছিল, তখন আমায় ছেঁচে নি?

—শাউড়ির ছেলে?

—সে জানতই না। শাউড়ি ভয়ে মুখ খুলত না। রইল কে? আতাপিসি! সে মুখ খুলত কোন্ সাহসে? সংসার তো আমার।

অহনা ক্ষীণস্বরে বলল, হ্যাঁ দিদি!

—মনে রেখে চলিস, কোনো কষ্ট হবে না। নে, পায়েসটা সরিয়ে রাখ। খুব খেলাম।

অহনা মনে মনে বুঝল, যে কনকাকে সে দেখেছে, তাকে সে চেনে না। সতীন করে এনেছে, কিন্তু স্বামীর মন অহনাতে বসলে সে খুশি হবে না।

হে ঠাকুর। এক বছর আমি থাকব কি করে?

রাতে অহনাকে সাজিয়ে, হাতে পান দিয়ে পাঠিয়ে দিল কনকা।

বলল, কাঠ মেরে থাকিস নি যেন।

ঘরে এসে খাটে বসল। আতাপিসি মেঝেতে শুত, কিন্তু বুড়ীর যে নাক ডাকে, কনকা আড়ি পেতে কিছু শুনতে পায় না।

অহনা পান নিয়ে হাত এগিয়ে দিল। গণপতি ঈষৎ হেসে ওর হাত ধরল। বলল, বেশ রেঁধেছিলে গো।

—দিদির মত হয় না।

—কেন, আমার তো বেশ লাগল।

—আপনি····দিদিকে কি বলেছেন ?

—কেন বল তো ?

—আমি কি····আপনাকে অছেন্দা করি ? করি না তো ? দিদি যেমন বলে, তেমন চলি····

—তুমি কাঁদছ ?

—আমি যে কিছুই জানি না····আপনারা বড় ···আমাকে শিখিয়ে নেবেন····

গণপতির হঠাৎ বড্ড মায়া হল। সত্যিই তো, এতটুকু শিশু চারা উপড়ে এনে, বাগানে বসাতে পারো। তরুণ, বাড়ন্ত গাছ উপড়ে আনলে তাকে নতুন মাটি ধরাতে সময় ও যত্ন লাগে। সে এক পূর্ণ যুবতীকে দেখে অধীর হয়েছে পুত্রাকাঙ্খায়। কিন্তু এ দেহে চতুর্দশী, মনে আট বছরের বালিকা, এখনো যেন সচেতন নয়।

—খুব ঢাকা চাপায় মানুষ হয়েছি····সব জানি না। আমি ·· আপনারা যা বলবেন তা করব। শুধু দোষ করলে····বলে দেবেন !

—এসো অহনা, কেঁদ না।

গভীর মমতায় অহনাকে কাছে টানল গণপতি ! আর অহনাও যেন পরম আশ্রয় পেয়ে গণপতির বুকে মুখ গুঁজল। গণপতি ওকে কানে কানে ফিসফিস করে বলতে থাকল, ভয় কি ? আমি আছি না ? কনকা গিন্নি থাকতে চায়।

—থাকুক না। আমি তো কিছু চাই না।

—সব ঠিক হয়ে যাবে অহনা, আমি আছি না ?

—আপনি আমায় কষ্ট পেতে দেবেন না তো ?

—কখনো না….

—আমায় ছেড়ে যাবেন না ?

—কখনো নয়….কাজে গেলেও ক'দিন বা ?

অহনা যেন পরম ভরসা পেয়ে গণপতিকে জড়িয়ে ধরল। আর এমন এক রাতে, অহনা যখন ভয়ার্ত, গণপতি যখন স্নেহমমতায় ব্যাকুল, তখন ক্রমে ক্রমে অহনার দেহমন থেকে এতদিনের বালিকা যেন বিদায় নিল।

সকালে কনকা যে গণপতিকে দেখল, সে থমথমে অসন্তুষ্ট নন, তবে গম্ভীর, চিন্তামগ্ন।

কনকা বলল, বেলা হল যে !

—হ্যাঁ….উঠি….

কনকা বুঝল, কি বুঝল তা সে জানে।

অহনার ব্যবহারে কোন অন্যরকম নেই। আজও সে কাপড় গামছা নিয়ে কাছে দাঁড়াল। বলল, দিদি, মাথায় তেল দিয়ে দেবে না ?

—কাল….ভয় পাসনি তো ?

অহনা বলল, না দিদি !

অহনার চিকণ, উজ্জ্বল, নরম গা গামছায় ঘষতে ঘষতে কনকা নিশ্বাস ফেলে বলল, এত রূপ তোর ! বেনে খুঁজেছিল ভাল।

অহনা, যেন পরিণত রমণীর মত আত্মমগ্ন নরম গলায় বলল, তুমি কি সুন্দরী নও ? যাদের দেখলাম এখানে, বাপের বাড়িতে, অনেকের চেয়ে তুমি অনেক সুন্দর। আমার মত ছায়ায় মায়ায় রাখত, তুমি তেমনই থাকতে। কাঁচ বয়স থেকে খেটে খেটে….

কনকা কি বলবে ? অহনা যেন তাকে সান্ত্বনা দিল।

॥ ৯ ॥

গণপতির বাড়িতে দুই সতীনে কেমন মিলে মিশে আছে এ কথা সবাই বলে। গণপতির বড় চিন্তা অহনাকে নিয়ে। কনকা এখনো কোন অশান্তি করেনি, যদি করে? মাঝে মাঝেই মনে হয়, কনকার বাপের বাড়ি থাকলে ভাল হত।

মুকুন্দ বলল, কি ভাবছ গণপতি? এত ভাবতে ভাবতে পথ চলেছ?

—যার ঘরে অশান্তি, সে ভাববে না তো কে ভাববে? তোমার সংসারে ঠাকুর! গৃহশান্তি আছে!

—তোমার গৃহেও তো বিবাদবিসম্বাদ শুনি না।

—ছোট বউ বিবাদের মানুষই নয়।

—বড় জনের বয়স হয়েছে, ছেলেমেয়ে হয়নি····

—তা নয় ঠাকুর!

গণপতি মাথা চুলকে বলল, আমরা সব যেন তার রাজত্বে আছি। তোমার সন্তান হল না। তুমি বলতে, বিয়ে করলাম, এমন কি লোকে করে না?

—খুব করে। তিনটে বিয়েও করে।

—তবে এমন একটা ফুলের মত মেয়েকে বিয়ে করলাম, বড় ভয় করে।

—তোমার দায়িত্ব, তারে রক্ষা করবে।

—বড় ধনীমানী বাপ, বিদ্বানও আছে। মেয়েকেও কিছু শিখিয়েছে। মঙ্গলচণ্ডীর পুঁথি পড়ে ঠাকুর। লক্ষ্মীপুজার পাঁচালী পড়ে।

—বেনা বনে মুক্তো বড় হারিয়ে যায় গণপতি!

—এখন তো উপায় নেই আর। কনকার কি! সব আমার

আমার! স্বামী, তার সংসার, তার সে যেটুকু দেবার দেবে। তার বাইরে গেলেই সর্বনাশ করবে সে। আমার মা'রে বেঁধে মারত। বুঝতাম, সয়ে গেছি। কেন না আমি ঘরে থাকি না। মার হয়ে কথা বললে মায়ের ওপরেই ঝালটা ঝাড়ত।

—সবই আমরা ঘর হতে শুনতাম।

—অহনা তো সুলক্ষণা। ও এসেছে থেকে বিক্রিবাটা ভাল হচ্ছে। তেপূর্ণির হাটে, তা পঞ্চাশ টাকা লাভ হল।

—সে তো ভাল হে। অত টাকা।

—আমরা সোনার কাজ তো গাঁয়ে বসে করতে পারব না আর। সে ক্ষমতা বা সামর্থ্য নেই। কেনাবেচা করতে করতে কোন হাট জমা নিতে পারি তো বেঁচে যাব।

—পারবে হয় তো!

গণপতির জন্যে একটা মমতা আছে মুকুন্দর। খুব সোদ মানুষ, সংসারী লোক সে। নতুন চাল উঠলে বছরের চাল কিনবে। তেল-মশলা-লবণ আনবে ভারে ভারে। এক বছর বাদে বাদে চালে খড় পালটাবে। কলা ও আম বেচবে। খাবে। কনকা যে এত চেঁচায়, গণপতির গলা শোনা যায় না।

গভীর মমতায় ও বেড়া বাঁধে, গরুর যত্ন করে, সর্বদা কাজ করে। নিঃসন্তান হবার জন্য ও সমাজে বড় দীনহীন ভাবে নিজেকে। এমন সামান্যে তৃপ্ত যে মানুষ, সে সেই সামান্যটুকু কেন পায় না? সামান্যে তৃপ্ত, সাধারণ মানুষদের বড় ভাল লাগে মুকুন্দর।

—ঠাকুর!

—বল?

—কনকার মন হতে অহনার উপর বিদ্বেষটি চলে যায়, এমন কোন উপায় আছে? কোন গ্রহশান্তি, বা যাগযজ্ঞে····

—আমার জানা নাই। আর গণপতি! এখানে সেখানে কে বলবে কবচ করে দেব, তাবিজ করে দেব, দেখলে না, অভিরাম কুণ্ডু এই করে করে সর্বস্ব খোয়াল?

—হ্যাঁ····তা বটে····তেগুনা যে অষুধ দিল, তাতে তো কাজ হয়নি····

—তুমি তো ঘরেই আছ। তবে ভাবনা কি ?

—কতদিন বা থাকব ?

গণপতি উজ্জ্বল চোখে বলল, শ্বশুর ব্যবস্থা করছেন। অনেক দূরে যাব ঠাকুর, ভাগীরথী তীরে। বাসনের নৌকা ধরব এবার।

—সে তো অনেক টাকার কাজ।

—তিনি হাওলাত দেবেন। পুঁজি আমারও কিছু আছে। কিন্তু কাঁসাপিতলের বাসন নিয়ে কেনাবেচা করতে পারলে····

—এখানে ?

—না না! এখানে কি বাজার মিলবে ? ত্রিনয়নীতে শ্বশুরের হেফাজতেই থাকবে সব। স্বপ্ন তো অনেক দেখি! রমরমা অবস্থা হয়েছে, ধরেন ক্রমে ত্রিনয়নীতেই জমি কিনে ঘর করলাম। ওখানে থাকলে অহনা বলুন, আমি বলুন, ভালই থাকব। কনকাও সুমঝে চলবে। ছেলেও ভাল থাকবে।

—সবে তো বিয়ে হল, দুই মাস।

গণপতি গভীর লজ্জায় হেসে, হাত কচলে বলল, আজ না হোক, হবে তো! হতেই হবে। সুপুত্রের মা হবে অহনা, ওর কোষ্ঠীতে আছে।

—মেয়ে হলে ?

—প্রথম সন্তান মেয়ে তো খুব ভাল, জ্যোতিষে বলে। মেয়ের পর ছেলে, চার পাঁচটা হোক না। বেটা চাই। কেন ? বংশটা রাখবে। আর! ছেলেপিলে আমি ভালবাসি ঠাকুর! ভাইপো ভাইঝিদের কোলে লয়ে ঘুরতাম, কাঁধে বসিয়ে মেলায় যেতাম। তারাও তো কাছে থাকল না। নিজেদের অংশ বেচে দিয়ে····

মানুষ বিষয়ে মুকুন্দর কৌতূহল চিরজাগ্রত। বলল, দামিন্যা ছেড়ে চলে যাবে ?

গণপতি সরল হেসে বলল, যাবার কালে তো সাধের পানসুপারিও

নিয়ে যেতে দেয় না যম, মাটি ছাড়তে কত দুঃখ পাব ?

মুকুন্দ গালে চড় খেল। সে বিদ্বান বলে সম্মানিত। কিন্তু এমন সকালে গণপতি, অনেক কম লেখাপড়া জানা মানুষ, কি দার্শনিক উক্তিটা না করল! মানুষ বড় চমকে দেয়, চেনা মানুষ নতুন হয়ে দেখা দেয় মাঝেমাঝে।

গণপতি বলল, দাদারা চলে গেল—আমিও দরকারে যাব। এতদিন সংসার করছি ঠাকুর! কিন্তু এখন মনে যেন মহাবল! মহাশক্তি! অহনা তো বলে, পুরুষের কাজই লক্ষ্মী। তুমি যেথা নিয়ে যাবে, সেথাই যাব।

—এইটে আমার বড় ভাল লাগে গণপতি। তোমাদের জাতের ব্যাপারে অবিচার করল বল্লাল সেন। কিন্তু তোমাদের জাতে কর্মশক্তি আর সাহস খুব বেশি। যে যেমন ভাবে পারে, ব্যবসা ব্যাপার করছে।

—বসে থাকলে ভাত দিবে কে ? তা ঠাকুর, আমার কোষ্ঠী তো ব্রহ্মকেশব মিশ্র করেছিলেন, তুমিও দেখছ। আমার কপালে যা যা চাই তা হবে তো ?

মুকুন্দ আন্তরিক সততায় বলল, সব হবে। আমি ব্রাহ্মণ, ধর্মাশ্রয়ী, আমার কথার যদি জোর থাকে, তোমার সব হবে। তোমার এই শ্বশুর একটা বটবৃক্ষ। ইঁনি যদি পাশে থাকেন, তোমার সব হবে।

—তাই বলো ঠাকুর। আটকুঁড়া বলে প্রথম ভিক্ষা আমার ঘরে নেয় না ভিখারী, প্রত্যূষে মাঠে দেখলে স্বজনও মুখ ফিরায়, এ যে কত বড় দুঃখ আমার, তা বলতে পারি না।

সেদিন রাতে মুকুন্দ তার বউকে সব বলল। বউ বলল, তেগুনাকে তো জানি। সে কনকাকে কি বা অষুদ বাকল দিয়েছে, যাতে স্বামী অহনাকে বিষনজরে দেখে। সেটি হয়নি বলে এখন মনে তেগুনা জ্বলছে। আর গণপতিকে অষুধ দিয়েছে যাতে কনকা প্রসন্ন থাকে।

—তুমি এত কথা জান কি করে ?

—হলা তোমার ঘরে বাগাল ! গ্রামসমাচার জানতে অসুবিধে আছে ? তুমি তো এ সংবাদও জান না যে কুণ্ডুবাড়ির ছেলে বাড়ি এসেছে ।

—হলা তেগুনার কাছে যায় কেন ?

—ধুলমন্তর শিখতে । ধুলমন্তর জানলে ও গাছে গাছে ঝুলবে, আমাদের গরু আপনি চরবে, আপনি গোহালে আসবে ।

—না, ওর কাছে যেন না যায় ।

—তেগুনা যে কতদিন এভাবে চালাবে ! কনকারে অষুদ দেয় স্বামী সতীনেরে বিষনজরে দেখবে ।

—গণপতিকে অষুদ দেয়, কনকা অহনাকে সুচক্ষে দেখবে ।

—সত্যি, অহনা যেন দেবীপ্রতিমা !

—দেখলে কোথায় ?

—সেদিন মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছিল কনকা ! অহনার রূপ যেমন আর চাহনি কি শান্ত !

—ভাল থাকলেই ভাল ।

—কনকার মুখে মধু । মনে বিষ । শাশুড়ি পোড়ো হল তো দিন দশবার শ্মশানে পাঠাত । ওদের আতাপিসি এই ঘাটে আসে মাঝে মাঝে । সাতপদ রাঁধলে বুড়ীকে দু'পদ দেয় । নিদম খাটায় ।

—যাক গে, ভেবে কি করবে ।

—এমন ঘরে বিয়ে করে ঠিক করেনি গণপতি । মেয়েটার লাঞ্ছনা হবে । হাত পা তুলতুলে, ওদের পিসি বলে । কোনদিন কষ্ট করেনি তো !

—শিখে নেবে, ভাব কেন ?

—তায় লিখতে পড়তে জানে । হ্যাঁ গো, মেয়েছেলের না কি পড়তে নেই ?

—আমার মা পড়তেন না ? আচার্যানী তোমার ব্রত পূজায়

পাঁচালী পড়েন না ?

—আমারে শিখালে না কেন ?

—শিখলে কোথা ? রাতে শিখাতাম, তোমার ঘুম পেত।

—এখনো ঘুম পাচ্ছে। সরো, শিউলিকে সরাই। গোড় খেয়ে মশারির ধারে আসবেই !

গণপতি ধীরে কথা বলছিল, অহনা শুনছিল আর একটু একটু কাঁদছিল। চোখ মুছে ফেলে আবার শুনছিল। গণপতি স্বাভাবিক গলাতেই বলছিল, কেন না কাল ও কনকাকেও এসব কথা বলেছে।

—বাসনের নৌকা ধরি, এ আমার অনেকদিনের ইচ্ছে।

—তত টাকা আছে ?

—নয় শ্বশুরমশায়ের কাছে হাওলাত নেব ?

—আমার সাতলহরী....

—না অহনা। পত্নীর অলঙ্কার লয়ে বেপার করলে তা ভাল নয় ! ব্যবসাব্যাপারে হাওলাত চলে সমাজে। শোধ করলেই হল। আমি কত সময়ে দশ বিশ টাকা হাওলাত নিই, লোকেও আমার কাছে নেয়।

—কিন্তু সে তো যেতে আসতে অনেকদিন লাগবে।

—কিসের ! শ্বশুর বলেছেন, বড় জোর এক মাস !

—বাবা যদি বলে থাকেন....

—অনেক সাধ আমার। অবস্থা বাড়াই, দরকারে অন্যত্র গিয়ে থাকব।

—কোথায় ?

—ধরো ত্রিনয়নীতে যদি বাড়ি করি ?

পাশের ঘরে কনকা নিশ্বাস চেপে শুনছিল। কি বলে ! অহনা কি বলে !

অহনা বলল, না। ভিটা ছাড়তে নেই।

—দাদারা চলে গেল....

—তোমার কাছে রেখে গেছেন। বাস্তুপূজা করে পূর্বপুরুষ ভিটেতে ঘর তুলেছেন···দিদি রোজ ঢেঁকশেলে বাস্তু মনসার নামে পিদিম দেয়, দুধ রাখে···বাস্তুই তো লক্ষ্মী।

—তুমি থাকতে পারবে তো ?

—দিদি আছে না ? দিদির সাহস কত ?

—সত্যিই খুব সাহস। এতকাল তো একলা সব সামলেছে। তোমাকেও···

—বুকে আগলে রাখে।

—এখন আর কান্না পাচ্ছে না তো ?

—বেনের বউ যদি, স্বামী দেশান্তরে গেলে কাঁদে, তাহলে চলে কি ?

—অন্যত্তর যাবার কথা অহনা ! নানা কারণে ভাবি। সবাই বলে সেলিমাবাদ পরগনায় নতুন উজির হবে মামুদ সরিফ।

—উজির কারে বলে ?

—দেশ দেখে যে !

—এ উজির হলে কি হবে ?

—এ নাকি অত্যাচারী। দেশের হাল খারাপ হবে। অনেক আগে, একবার এমন হয়েছিল। আমি দেখি নাই, ঠাকুমার মুখে শোনা। সে সময়ে রূপার টাকা সিকি, তামার পয়সা, বাসনকোসন অলঙ্কার ঘরের মেঝেতে পুঁতে মেয়েরা গলায় লাল সুতো, হাতে গালার বালা পরত। সবাই কড়ি নিয়ে ব্যবসা করত। এ যদি তেমন হয়, তবে সবাই পালাবে

অহনা ঘুমঘুম গলায় বলল, হোক তো ! তখন দেখা যাবে।

—নাও শুয়ে পড়।

—তাই শুই। বড্ড ঘুম লেগেছে আজ !

গণপতিকে জড়িয়ে তার কাঁধে মুখ রেখে নিদ্রা গেল অহনা ! গণপতি তার শরীর জাগাতে চেষ্টাও করল না। মাথায় হাত বুলাতে থাকল। অহনা ! তোরে রেখে যেতেই চিন্তা আমার।

কনকা যদি একটু বুঝত !

বুঝলে তো প্রত্যহ অহনাকেই ঘর ছেড়ে দিত। পালঙ্ক রং পালিশ করে ঝকঝকে। নতুন বিছানা, নতুন মাদুর, কড়ির আলনায় অহনার নতুন নতুন শাড়ি, ঘরের ওপাশে সিন্ধুকে থরে থরে নতুন বাসন।

অহনার মুখ যেন ভোরের পদ্মফুল, চোখের পাতা কি নিবিড়। অহনা! তোর কপালেই সতীনঘর লিখল বিধাতা ? কেন ?

গণপতি যাত্রার জন্য তৈরি হয়। সাংসারিক কথাবার্তা বলতে কনকাই ভাল। তার অগ্রাধিকারও বটে।

—দিনকাল ভাল নয় কনকা, তোমাকে আমি মস্ত দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি।

—অহনা ভাল থাকবে।

—সে তো থাকবে, তুমি আছ। দেখ! সময় এখন একরকম, মন্দও হতে পারে।

—কি হবে বল তো ?

—উজির যদি মন্দ হয়, ডিহিদার, আমিন, তশীলদার, সকল পদেই সে মন্দ লোক আনবে। অত্যাচার হতে পারে, দেশ ছেড়ে পালাতে পারে লোক।

—এমন সময়ে বিদেশে যাচ্ছ বা কেন ?

—শ্বশুর যোগাযোগ করেছেন....সুযোগটা হারালে আর পাব ?

—তা বটে।

—দেখ! অহনার সঙ্গে যে ঘরে অনেক ধনদৌলত ঢুকেছে, এটাও তো জানে সবাই।

—সবাই জানে।

—সব চোরকুঠুরিতে রাখলে ভাল।

—কি রাখবে সেখানে ?

—বাসনকোসন, তোমাদের গয়নাগাঁটি, গায়ে সামান্যই রেখো।

—রাখব।

—কড়ি দিয়েই সওদা কোর, রূপোর টাকা ভাঙিও না।

—ভাবছ কেন? তুমিও তো সত্বর ফিরবে।

—ইচ্ছা তো তাই। কিন্তু আপন ইচ্ছাতে কি কাজ হয় বলো?

—এবার যেন বেশি কাতর হচ্ছ?

—এত বড় কাজ তো করিনি। বড় জোর শ'টাকার কারবার করি, পাঁচশো টাকায় বাসনের নৌকা....

—দরকার কি, আমাদের অত টাকায়?

—দরকার তো হবে কনকা। ঘরে ছেলেমেয়ে আসবে...খাওয়ার মুখ বাড়বে....

কনকা নিশ্বাস ফেলে বলল, তবে তাই।

—আমার শুধু একটা কথা!

—কি, বল?

—কতদিন বিয়ে হয়েছে বল তো?

—তা আড়াই মাস হল।

—হয়তো....হয়তো....

—তাই না কি? আমাকে তো বলে নি।

—আমাকেও বলে নি। তবু....তুমি জেনে নিও।

কনকার প্রথমে মনে হল, রোজ শুতে দিই না, এমন বাঁধাবাঁধিতে রাখি, মাগী এর মধ্যেই ফল ধরল? তারপর মনে হল সরস্বতী তো এ মাসে ঋতুমতী, বৎসর না যেতে বেটার মা!

ঈর্ষা ও হতাশায় মিশ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে কনকা ধারালো হেসে বলল, তুমি বলো কাঠের পুতুল!

—যদি হয়, তবে আমার বিদেশ থাকা কালে ওকে খুব সাবধানে রেখো। ছেলের জন্যই বিয়ে, নচেৎ বিয়ে কেন? দরকার তো ছিল না? বল, আমার গা ছুঁয়ে কথা দাও। বউ তোমার কথায় এনেছি, বল কনকা!

কনকা গণপতির হাত চেপে ধরল। বলল, আমি বুকে ধরে

রাখব। ওর বেটা হোক, সে তো আমারও সাধ গো! নইলে স্বামীর ভাগ সতীনকে কেউ দেয়।

তারপর বলল, বেশ হবে। বর্ধমানে আর সপ্তগ্রামে ওরা জ্বলে মরবে। ওদের এত আছে, তবু আমাদের বিষয়টুকুর ওপর কম লোভ ওদের? তবে বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ! ছেলে হলে কোমরে গোট নেব আমি, মেয়ে হলে তিনলহরী।

—আর অহনা?

—ছেলে হলে মকরমুখী বালা, মেয়ে হলে সোনার তেঁতুলবিছে হার। মানুষ করব আমি, "বড় মা" বলবে আমায়।

গণপতি কনকার কপালে চুমো খেয়ে বলল, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমারে ডাকবে "মা", আর তারে ডাকবে "ছোট মা"।

—সে আরো ভাল।

—তাই হবে।

—আশ্চর্য! ছুঁড়ি হয় তো বোঝেই নি। হাবি তো! কিছুই বোঝে না সহজে।

—আমি আন্দাজ করি⋯রং যেন ফ্যাকাশে লাগল তাতেই। না হতেও পারে।

—জানো, অহনা কি বলে?

—কি?

—বলে, দিদি তুমি খুব রূপসী। শুধু খেটে খেটে তোমার এ হাল! আবার বলবে, তোমার মত ভারি কলস কেন তুলতে পারি না! তোমার মত ধান সিজাতে কেন পারি না! পা ছড়িয়ে বসবে গালে হাত দিয়ে। বলবে, মা কিছু শিখায় নি গো? এমন তুসুতুসু করে মেয়ে মানুষ করে কেউ?

—দাও না কেন?

—এতদিন দিইনি, মায়া লাগে বলে। সেই তো সবই করবে। যতদিন না করে চলে! আর এখন তো দিবই না। একটু হেঁচকা টান লাগল, কি ব্যথা পেল, গা খসে যায় যদি?

কথাগুলি কনকা আন্তরিক সততাতেই বলল, আর গণপতিও মনে মনে নিশ্চিন্ত হল।

—যেথা যাও, খবর পাঠিও।

—পাঠাব, পত্র দেব।

সকালে কনকা ঘাটে যাবার পথে বলল, অ নেকী! এ কি শুনছি?

—কি শুনছ দিদি?

—তোর না কি....

অহনার মুখ গাঢ় লাল হল।

—জানি না দিদি!

—বলি, ইয়ে হয়েছে এ মাসে?

—না দিদি।

—তবে?

—সব সময়ে কি তারিখ মেনে হয় না কি? কত সময়ে তো....

—মুখ দেখি? চা' আমার দিকে।

অহনা চিবুক তুলে মাথা পিছনে হেলাল। কনকা বলল, কি জানি! সকালে বমি হয়?

—বমি হবে কেন? যাও, তুমি বড্ড....চল, ঘাটে চল।

—সাবধানে থাকবি অহনা। পা ফেলতে সাবধান, ঘাটে নামতে সাবধান। আর এই ঘাটের সিঁড়ি। গদারে দিয়ে বালি আর নারকেল দড়িতে মাজাব। হতভাগা না বললে কিছুই করে না?

—অ দিদি, বর্ষাকালে কি হবে? সিঁড়ি ডুবে যাবে?

—সাঁতার জানিস না?

—না। ভয় করত, শিখিনি।

—বর্ষাকাল আসুক তো। জালায় জল রাখব, ঢেঁকিশেলের পেছনে নাইবি।

—বর্ষাকালে তুমি সাঁৎলাভাজা কর?

—করি। মুড়ি ভেজে দেব, চাল ভেজে দেব, তালের বড়া,

তালক্ষীর, অনেক খাওয়াব। চ' এখন।

—শোনো দিদি! সরস্বতী আসছে। ওরে কিছু বল না কিন্তু।

—আমাকে শেখাস নি। তিন মাস হবে, নিশ্চিত জানব. তবে জানতে দেব। মামী তো আগে জানবে। পঞ্চামৃত খাওয়াবে না?

—এখানে এসে?

—নেকী কি সাধে বলি? দিনক্ষণ দেখে পাঠিয়ে দেব। প্রথমবার মায়ের কাছেই ভাল। সে গ্রামও নগর সমান। ভাল ভাল পার্থি আছে নিশ্চয়।

অহনা. গণপতির শিক্ষায় মনের কথা লুকাতে শিখেছে। গণপতি বলেছে. কনকা ক্ষণে মোহিনী. ক্ষণে বাঘিনী হতে পারে। তোমার নিজেরই ভাল হবে. যদি সদাসব্যদা ওর মন তুষে চলতে পার. বুঝেছ?

—পারব?

—পারতেই হবে. কথা দাও গা ছুঁয়ে।

—তুমি তো জাপটে ধরে আছ। আমি গা ছোঁব কেমন করে?

—ঠিক। এবার কথা দাও।

—দিলাম। ছাড়ো. নিশ্বাস আটকে যায় যে!

—এই তো মুশকিল। এমন নরম তুমি····

কনকা যখন বলল. "ভাল ভাল পার্থি আছে তো?"

—আছে। সুপ্রসবও করায়।

—তবে সেখানেই ভাল।

—এখানে তোমার ঘাড়ে পড়ব?

—না গো না! যাক, সময় আসুক. সেখানে মামীর লোকবল. দাসী অনেক। যত্নটা হবে।

অহনা মনে মনে খুব নিশ্চিন্ত হল। মুখে বলল, তুমিও যাবে।

—আমি কেন?

—মামার বাড়ি না তোমার?

—এখানে হেঁসেল, এরে দেখা, গরু, গোহাল, বাগান,

আতাপিসি, চাকর, মুনিষ! আমি এ বাড়িতে ডুলি চড়ে নেমেছি, মাচায় শুয়ে বেরোব। হ্যাঁ, মোটে কি বেরোই নি? একবার চড়ক দেখতে নিশিন্দাপুর! হয়ে গেল।

—বাপের বাড়ি মোটে যাওনি?

—মা মরে গেলে বাপ যদি বিমাতা আনে, বাপের বাড়ির দোর বন্ধ হয়ে যায় বোন! বাবাও কলতা ছেড়ে কোথা চাকদহ চলে গেছে।

—বোনদের সঙ্গে দেখা হয় না?

—নদীতে নদীতে দেখা হতে পারে, বোনে বোনে দেখা হয় না রে। যে যার সংসারে হেঁসেলে বাঁধা। উংরুনির চানে না কি মেজদি এসেছিল, ন'বছরের পর তো দেখিনি। দেখলেও চিনতে পারিনি।

—মা গো! ভাবতে পারি না। তোমার কথায় দেখ! গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

—আমার জগৎ, ইহকাল, পরকাল এই বাড়ি আর বাড়ির মানুষটা।

—হ্যাঁ দিদি। তোমারই তো সব।

সরস্বতী ডেকে বলল, আর গা মাজ্যনা করিসনে গঙ্গাজল। দামিন্যার জলে এমনিতেই গা ফর্সা হয়। অহনার রং এমনিতে গোরা!

—ওই একটু, পিঠে তো হাত পায় না। আমি বাপু ময়লা গা. ময়লা কাপড়, সহ্য করতে পারি না। নে অহনা. ডুব দিয়ে নে।

কানে আঙুল দিয়ে অহনা ডুব দিল।

॥ ১০ ॥

দামিন্যা কেন গ্রামে গ্রামে বার্তা রটে গেল যে গণপতি বেনে ভাগ্যান্বেষণে বাইরে যাচ্ছে। একদা গন্ধবণিকরা দেশে দেশে বাণিজ্য করত। চাঁদ সওদাগর, ধনপতি সওদাগরের কাহিনী তো মুখে-মুখে ফেরে।

মুকুন্দর বউ বলে, হ্যাঁ গো, মনসাকথা সত্যি, না গল্প ?

—সত্যি থেকেই গল্প হয় বটে।

—সে কি রকম ?

—মনসা, শীতলা, ঘেঁটু, ওলাইচণ্ডী, এঁদের পূজা করত এক কালে নিম্নবর্গের মানুষ। তা আমরা নিম্নবর্গের মানুষ না হই, সাপ, অসুখ, ছেলেপিলের ব্যামো এ সব তো বড়ো জাত ছোট জাত জানে না।

—তাই জানতে পারে ?

—তা, সর্পদংশনে মৃত্যু তো অনেক। সাপের দেবী মনসা, তিনি বাস্তুও বটেন। ওই চাঁদ সদাগরকে দিয়ে পূজা করিয়ে তিনিও খানিক পাত পেলেন।

—যাঃ, তুমি জান না।

—এমনি করেই দেবদেবীর উৎপত্তি হয় বউ! কদম্বেশ্বর শিবকে দেখলে না ? সুন্দর পাথরটি গাছের নিচে ছিল। যে মেয়ে চান করে উঠে আসত একটু জল দিত। শেষে বসিক দীঘড়ি উটিকে সদাজাগ্রত শিব বলে পিতিষ্ঠে করলেন বই তো নয় ?

—বাপ রে জাগ্রত শিব!

—তুমি দেখেছ জাগতে ?

—একজনরে তো নিত্য দেখি।

—সে তো ভাল বউ, গ্রাম তো সরগরম!

—কেন ?

—গ্রামজীবন! আমরা কি বা দেখি! সে জীবনে গণপতি বিদেশ যাবে, এটা সংবাদ নয় ?

সত্যিই চণ্ডীমণ্ডপ সরগরম হ'ল।

হরিহর মিশ্র সবেতেই "ঘোর কলি" দেখতে পান। তিনি কলিকালের খবর টের পান সবসময়ে। ঘোর কলি না হলে তাঁর ব্রাহ্মণীরা কেজেকোন্দল করত না। তাঁর কুলপ্রদীপ গোমূর্খ হয়ে

থাকত না। কাঁসারি তাঁর পিতলের ঘড়া সারিয়ে পয়সা চাইত না।

তিনি বললেন, আরে রাম রাম! দেখ কি তোমরা? সোনার বেনের ছেলে বড় ব্যাপারী হতে যাচ্ছে। কি, মুকুন্দ?

—বণিক তো বটে, ব্যবসা করবে না?

—তোমরা আজকের ছেলে। এমন কথা বলবে না? গন্ধবণিকরা যেত, সে সব শুনেছি। তা বলে এরা দিকে দিকে...

—ওর দাদারা তো কবেই গেছে।

—সে তো বর্ধমানে, বিদেশে। এর ঘর তো দামিন্যা। দেখ! এ সব নতুন কালের হাওয়া। একাদশ বঙ্গাব্দ তো! কলির লগ্ন এটি।

মুকুন্দর যজমান বসুভূতি দত্ত ঈষৎ হেসে বললেন, এ তো খুব ভাল কাজ করছে গণপতি। কর্মোদ্যোগী পুরুষই ভাগ্যজয় করে।

—ও জাতের কপালে যদি তাই লেখা থাকত, তাহলে ওরা জাতে পতিত হল কেন?

মুকুন্দ সহাস্যে বলল, পঞ্চম-ষষ্ঠ বঙ্গাব্দ অবধি সুবর্ণবণিক উচ্চজাতি। রাজাদের শ্রেষ্ঠী তারা। রাজাকে স্বর্ণঋণ দেয়।

—তোমারে বলেছে!

—পুঁথি পড়লে জানতেন।

—বামুনের অত পুঁথি পড়ে হবে কি? পুজা-বিবাহ-শ্রাদ্ধ-হেন তেন যা করাবে তার মন্ত্র কণ্ঠস্থ।

—পুঁথি না পড়েও অনেক জানা যায় হে!

—শুনুন! বল্লালসেনের সময়ে সুবর্ণ বণিকরা স্বর্ণ ঋণ দিয়ে দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। বল্লভানন্দ শ্রেষ্ঠীর জামাই ছিলেন মগধের রাজা। বল্লালসেন বার বার সোনা নেন। শোধ দেন না। তখন বল্লভানন্দ স্বর্ণ বিনিময়ে হরিকেলের রাজস্ব দাবী করলেন। তখন, আক্রোশভরে বল্লালসেন এদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, জাতে পতিত করেন, জানলেন? সেই থেকে এদের গৌরবরবি অস্তে গেল।

—ওঃ! খুব যে বলে গেলে! এ সব কথা কি সত্য হতে পারে?

—"বল্লালচরিত" গ্রন্থে পড়েছি।

—পুঁথিতে লেখা থাকলে তাতেই বিশ্বাস করবে? আর, এ সব কথা যদি সত্য হত, আমরা শুনতাম না কখনো?

মুকুন্দ বলল, পুঁথির কথা বিশ্বাস করব না কেন?

বসুভূতি ঈষৎ হেসে বললেন, মিশ্র ঠাকুর! মিছে রাগ করছেন। পুঁথিতে লেখা আছে প্রাচীন সময়ের কথা। এ সব কথা আপনি বা আমি শুনব কি করে? এ তো গ্রাম্য গজালি নয়।

—তবে বিশ্বাস করুন! আরে, প্রাচীনে যা জানে, অর্বাচীন তা জানতে পারে?

—এর মত পণ্ডিত বিদ্বান এ দিগরে নাই ঠাকুর। দামিন্যার ভাগ্য যে এমন মানুষরা হেথায় বসত করেছে।

—এ সব গণাব শ্বশুরের পরামর্শ।

—গণপতির শ্বশুর শচীপতি যথেষ্ট অর্থশালী, সম্মানিত মানুষও বটেন। দেবদ্বিজে ভক্তি, দানধ্যান, বছর বছর দীঘি খুঁড়ে জলোৎসর্গ, উচ্চবর্ণের মধ্যেও এমন মানুষ বিরল।

হরিহর মিশ্র কুটিলমনা পরশ্রীকাতর মানুষ। তিনি বাঁকা হেসে বললেন, খুব ভাল লোক! শুধু দেশাচার—সমাজবিধি উড়িয়ে দিয়ে রজস্বলা মেয়েকে ঘরে রেখেছিল। কি হে মুকুন্দ, কি বলো?

গম্ভীর ও কঠিন গলায় মুকুন্দ বলল, কোষ্ঠীতে তেমন নির্দেশই ছিল। কোষ্ঠী করেছিলেন স্বয়ং রামাচার্য।

সবাই নিশ্চুপ। এ-ওর দিকে চায়, মাথা নামায়। পরাজিত হরিহর বললেন, এ কথা তো জানতাম না।

—আমি শচীপতির কথায় কোষ্ঠি পুনর্বিচার করেছি। কোষ্ঠীর কথা মানতে গেলে মেয়ে বিয়ের পরে বিধবা হত। চৌদ্দ বছর না হলে বিয়ে দেওয়া চলত না। আর কি বলবেন, বলুন?

—না, এ আমি জানতাম না।

—কি ভেবেছিলেন?

—কোনো কেচ্ছাকেলেঙ্কারী না থাকলে গণার হাতে ও মেয়ে দেয় ?

বসুভূতির কথার দাম আছে দামিন্যায়। তিনি বললেন, মন্দ কাজ হয়েছে কি ? গণপতি নিঃসন্তান। বিয়ে না করলে ওর বংশ থাকত না। সে ক্ষেত্রে এ মেয়ে চতুর্দশী, এরে বিয়ে করেছে, সত্বর সন্তানমুখ দেখতে পারে। আমার বাড়ির দাসীরা দেখে এসেছে। মেয়ে পরমাসুন্দরী, দেবকন্যা বললেও হয়। যৌতুকও এসেছে অনেক। স্বভাব না কি দীঘির অতলের জলের মত শান্ত।

—যাক ! ভাল হলেই ভাল।

বসুভূতির ভাই ভবভূতি বললেন, চণ্ডীমণ্ডপে বসে কি শুধু পরচর্চা করব ? দুটো কাজের কথা হোক না ?

বসুভূতি বললেন, লও ভাই ! তোমার এক চিন্তা লও, কি বলবে বলো।

—কিছু তো নিজেদের কথা আছে। এখানে বসে আমরা পরনিন্দা, অলস গল্প করি। কিন্তু অন্য কথা বলি না। আগে এখানে গ্রামের, গ্রামবাসীর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা হত, ব্যবস্থা হত। এই যে তালপুকুরটি····

বসুভূতি বললেন, এ আর কথা কি ! পানীয় জলের পুকুর, আগে আড়ি খুব উঁচু ছিল, গরু ছাগলে জলের নাগাল পেত না···· তা আড়ি ভেঙে পড়েছে। সে ধরো আমিই করে দেব। পানীয় জলের পুকুরটি সুরক্ষিত রাখা দরকার।

—তা নয় করলেন আপনি। কিন্তু আরো যে সংকট আসছে।

—কেন, কেন ? কোথাও দেবার্চনায় ত্রুটি হয়েছে ? কেউ অসামাজিক কোন কাজ করেছে ?

—দেবতা নয় মানুষ ! খবর শুনছি মামুদ সরিফ আসছে উজীর হয়ে।

হরিহর বললেন, তাতে আমাদের কি ?

—সে কাঁচাখেগো মানুষ। ভয়ংকর অত্যাচারী। সেলিমাবাদে

অত্যাচার নামাবে।

মুকুন্দ বলল, আমিও শুনেছি।

বসুভূতি দত্ত ধীরস্থির মানুষ। তিনি বললেন, শাসনকর্তা বদল হলে প্রজার মনে আতঙ্ক ঢুকতেই পারে। তবে জানলে জানবেন গোপীনাথ নন্দীনিয়োগী। তিনি তালুকদার মানুষ। উজির-নাজির-ডিহিদারের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁরই আছে। ঠাকুর! কি বলো?

মুকুন্দ বলল, সেও ধরুন, তিনমাস আগে দেখা করে এসেছি। তিনি উদ্বিগ্ন তো বটেই।

বসুভূতি তেমন বিচলিত হলেন না। বললেন, সকলের যা হবে, আমাদেরও তা হবে।

অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মকেশবের ভাই সুধন্য, যেন বসুভূতির দিকে কটাক্ষ করে বললেন, যাদের তালুকমুলুক আছে, তারা চিন্তা করুক। নেংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।

মুকুন্দ বলল, এটা কি বললেন? ঝড় এলে কি একজনের ঘরই পড়ে? আগুন লাগলে কি একখানা চালা পোড়ে? শাসক অত্যাচারী হলে সবারই দুর্দিন!

সুধন্য বললেন, তেগুনার কাছে গিয়েছিল ত্রিনয়ন। তেগুনা বলেছে, গাঁয়ে কু-বাতাস ঘুরছে।

মুকুন্দ বলল, ওর কথা ছাড়ুন।

—খুব জানে শোনে হে!

—অত্যাচারী উজীর আসাটা বন্ধ করুক তবে? আপনারাও ওকে....

বসুভূতি বললেন, দরকার পড়ে তো দেশান্তরী হব। তবে ঠাকুর! তুমি তো যেতে পারবে না। আরেকটা নতুন ঘর তুলেছ, গাইও কিনেছ। যেতে পারবে না।

—দত্ত মহাশয়! বাঘ এলে গরু শক্ত খোঁটা উপড়েই পালায়।

দামিন্যাবাসী গুরুগম্ভীর কথা ভালবাসে না।

হরিহর মিশ্র ভাবলেন, মুকুন্দ বড় বেশি ভাবছে। বিপদ কোথায়? সূর্য উঠছে, দিন হচ্ছে, যে যার কাজ নিয়ে আছে। সন্ধ্যার পর সুখে নিদ্রা যাচ্ছে।

বললেন, বাঘ এলে বাঘের ব্যবস্থা হবে।

“বাঘ” শুনে সুধন্য বললেন, বাঘের কথা যদি বলো, তবে বলি শোনো। উদ্ধারণপুরের ঘাটে নিত্য এক বাঘ আসত। বসে জপ করত, এ আমার স্বচক্ষে দেখা। গায়ে যেন চন্দনের গন্ধ। আর ভক্তি কি!

এ গল্প সবাই অনেকবার শুনেছে, আবারও শুনতে থাকল। দামিন্যায় এমন কয়েকটি গল্প আছে বটে। কোন মেয়েকে না কি বেঁধেছেঁদে সতী করেছিল। শ্মশানে সে প্রেতিনী হয়ে ঘোরে ও আর্তনাদ করে, জ্বলে গেলাম! জ্বলে গেলাম!

কেউই শোনে নি, কিন্তু কাহিনীটি বিশ্বাস করে। যেমন বিশ্বাস করে, কৃষ্ণদীঘিতে মানত করলে জলদেবতা বাসন ও অলঙ্কার দেন। একাদশ বঙ্গাব্দের বুকে অনেক অন্ধকার রহস্য, যা কেউ আলো ফেলে দেখে নি।

ঘরে ফিরে মুকুন্দ হাতমুখ ধুল। সন্ধ্যাআহ্নিক করল। বাড়ি মানে গোহালে সাঁজালের ধোয়া। বাড়ি মানে পাকশালে রান্নার সুবাস। বাড়ি মানে সান্ধ্যআরতির প্রসাদের লোভে শিবু ও শিউলির বসে থাকা।

সব মিটিয়ে ঘরে ঢুকে বউ মুকুন্দকে একটি পান দিল। নিজেও খেল।

—হলধরের শেষ সমাচার কি? সে তো তেগুনার শিষ্য হয়েছে।

—সে এক আশ্চাজ্জ কথা।

—কেমন “আশ্চাজ্জ”? “আশ্চাজ্জ” নয়, “আশ্চর্য” বলতে পারো না?

—তুমি সুবচনীর কথা বলতে পার?

—না পারি না।

বউ খাটের কিনারায় বসল পা ঝুলিয়ে। বলল, তেগুনার মুখ পুড়েছে খুব।

—কিসে মুখ পুড়ল ?

—হলা বলছে, বামুন মা! বুড়ী কিছু জানে না। বুড়ী অষুদপালা দিয়েছিল বেনের বউরে, যাতে দু সতীনে বিবাদ হয়। সে তো হ'ল না। আবার দুই সতীনে এমন মিলমিশ, যে তাও দেখা যায় না। ঝগড়া বিবাদ হ'ল না, এ-ওরে ভাল চোখে দেখছে। বুড়ীর অষুদপালা মিছে।

—তেগুনা একটা অশুভ মেয়েমানুষ, অপরের ক্ষতি ছাড়া চিন্তা নেই। গণপতির বউরা বলো, অন্য যে কোনো পরিবার বলো, মানুষকে মিলেমিশে থাকতে দেখলে ওর বুক পোড়ে। শুধু চায় ক্ষতি করতে।

—ও কি বিদ্যেবতী, না চাষীবাসী, না আর কিছু? সবাই যদি ভাল থাকবে তাহলে ওর চালটা আনাজটা তেল নুন কাপড় আসবে কোথা থেকে ?

—গ্রামের মানুষই ওকে মাথায় তুলেছে। সবাই সদাসর্বদা যায় ওর কাছে। বামুন কায়েত, নানা জাতের মানুষ।

বউ ঈষৎ হেসে বলল, মারণ—উচাটন করতে পারে, ভূত-পিশাচ লেলিয়ে দেয়, বশীকরণ মন্ত্র জানে, মানুষ যায়।

—কিছু জানে না বউ। আকুল সাহা গেল, কত কি যজ্ঞ করাল ওকে দিয়ে, যাতে সন্তানগুলি ভূমিষ্ঠ হয়েই না মরে। কাজ হ'ল ?

—ও বলবে, নিশ্চয় নিয়মবিধি পালনে দোষ হয়েছে, তাই কাজ হয় নি।

—না না, তেগুনার কথা বোল না। দেখ! বলরামের ছেলে বলে হলাকে কিছু বলি না। কিন্তু তেগুনার চেলা হয়ে যদি দোঁড়ায়, ওকে গরুর বাগাল রাখব না। এমনিতেই তো মন্দ ছেলে। বাপ-মা বলে কোন টান নেই। বাড়ির জন্যে এক ছড়া কলা

দিলে, সবগুলো মাঠে যেয়ে খেয়েছে। ভাইবোন বলে একটু মমতা নেই!

—সত্যি রেগে গেলে?

—আর একদিনও ওর কাছে যাবে তো এ বাড়ি ঢুকতে দেব না। ওই সব গল্প করে, শিবু শোনে। না না! ওর বাপকে বলি না, তার রাগ প্রচণ্ড। নির্দম মারবে ছেলেকে। ঘরের ছেলের মত রেখেছি…সে আজ কোথায়? বাড়িতে দেখলাম না?

—বাড়ি গেছে। মা পিঠে ভেজেছে। আমি, আমি ওকে বলব।

—তুমি বলবে কড়া কথা? তাও হলধরকে? ও তোমার কাজ নয়। তেগুনা গণপতিদের ক্ষতি করছে জেনে সবচেয়ে রাগ হয়েছে আমার। পঞ্চজনরে ডেকে ওরে গাঁ-খেদা করাব।

—মানুষের দোষে ওরে শাস্তি দেবে?

—তার মানে?

চোখে জল, গলা কেঁপে গেল। তবু বউ বলল, মানুষই তো চাইছে এর ক্ষতি করি ওর ঘর পুড়ে যাক, ও মরুক। চাইছে পিশাচ লেলিয়ে দিয়ে বৈমাত্র্য ভাইয়ের রক্ত চুষে খাই। বামুন-কায়েত-বদ্যি-বেনে-সদগোপ-কয়ালী-হাড়ি-ডোম-বাউড়ি সবাই চাইছে। সর্বদা যাচ্ছে। তেগুনা কি ডাকে তাদের?

—না, ওদের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগটি নেয়।

—শুধু তেগুনা কেন? মানুষকেও বল হিংসে বিবাদ ভুলে যাক? ক্ষতি চেয়ো না, ভাল চাও? তা তো পারবে না।

—তাই তো!

—কি হ'ল?

—সেদিন গণপতি, আজ তুই, বড় জ্ঞান দিলি আমারে। গণপতি বলল, দেশ ছাড়তে হলে ছাড়ব। মরার কালে একটা সুতোও নিয়ে যেতে পারব না। দেশ ছাড়তে কি এতই মায়া? আবার তুই বললি, মানুষ যদি দ্বেষ হিংসা ভোলে, তেগুনার দরকারই হবে না। না, পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও মানুষ জ্ঞানী হয় দেখছি।

—যাক, যত বোকা ভাব, তত বোকা নই।

—তবে হলা আবার যদি যায়····

—ওরে খেতে দিব না।

—সে তুই পারবি না। খেতে চাইলে না দিয়ে পারবি না।

—মা যেমন শিখিয়ে গেছে।

—কিন্তু নিষেধ করবি। বলবি আমি রেগে গেছি। সেদিন গণপতির কথায় তো বুঝলাম, অহনার কি হবে ভেবে গণপতি ভয় পাচ্ছে। ওর ভয়, কনকা যদি কোন ক্ষতি করে।

—না না, অহনা ভাল থাকবে। আমি রোজ ওর নামে ফুল তুলসী দিই। কি রূপ মেয়েটার! যেন দেবতাদের মেয়ে। চাহনি আমার শিউলির মত।

—যাক, লক্ষ্য করিস নি।

—কি, বল তো?

—তোকে "তুই" বলছি কিছুক্ষণ ধরে।

বউয়ের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। পানের রসে টুকটুকে ঠোঁট একটু ফাঁক।

ও তর্জনী তুলে বলল। তাই তো? মা চলে যাবার পর থেকে বড় আস্পদ্দা বেড়েছে তোমার ঠাকুর! ঘরনীগিন্নী মানুষকে "তুই" বলবে সুযোগ পেলেই? তোমাকে আমি····

মুকুন্দ বউয়ের মুখটি বন্ধ করে দিল।

কিন্তু অহনার জন্যে বউয়ের গভীর, গভীর উদ্বেগের কোন ভিত্তি আছে, এমনটা বোঝা গেল না কিছুকাল।

কেন না, স্বামীকে যে কথা দিয়েছে, তা কনকা রক্ষা করে চলছিল। অহনাকে যত্ন করছিল, সদাসর্বদা চোখ রাখছিল ওর কোন অনিষ্ট না হয়।

মধুকর তার বউদের বলল, গণপতির বাড়ি দেখে তোমরা শিখতে পার না? কে বলবে ও বাড়িতে দুই সতীন থাকে, স্বামী ঘরে নেই?

সরস্বতী বলল, ওগো! গঙ্গাজলকে চেনো না। এটুকু দেখেই ধন্য ধন্য কোর না। উনি যখন যা করে মতলবে করে।

লক্ষ্মী বলল, তোর না সই?

—সই হোক, যা হোক নেয্য কথা কইব। যদি কেউ ওর ঘাড়ে পড়ে, ও চিবিয়ে খায়। শাউড়ির খোয়ার কেমন করেছিল?

যদুনন্দনের বিধবা বোন হরিমতী চালবাটা-তিলবাটা দিয়ে কুমড়া ফুলে বড়া ভাজা আর চালতার টক নিয়ে গেল কনকাদের জন্যে।

এসে বলল, কি বা দেখলাম মা! বড় জনা নানা নিধি রেঁধে ছোটজনারে খাওয়াচ্ছে, আর ছোটজনা বলছে, আর পারব না দিদি!

যদুনন্দন বলল, দেখে দুঃখ পেলি তো?

—সে তো পেলামই। সতীনে সতীনে ভাব, কে কবে শুনেছে বলো?

যদুর মা বললেন, কলিকাল এসে পড়েছে। এখন কত বিপরীত ভাব দেখবে!

বস্তুত দামিন্যাগ্রামে এ ঘটনা এমন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে যে সবাই রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল কবে এ বাতাবরণ ছিঁড়ে যায়। ঝাঁপি খুলে সাপ বেরিয়ে ডানা মেলে।

এতদিনে কনকা সুনিশ্চিত যে অহনা গর্ভবতী। এতে সে মনে মনে ঈর্ষা করছে, আবার অহনার নিষ্পাপ নির্ভরতা দেখে সে নিমেষে কোমল হয়। না, গণপতির বড় আকাঙ্ক্ষা ছেলে কোলে নেয়। কনকারই কি ইচ্ছা যায় না যে প্রভাতে কারো মুখে "বাঁজী" না শোনে? কেন না অহনা বলেই রেখেছে হবার আগেই, দিদি! সন্তান তোমারে দিলাম। তুমি "মা", আমি "ছোট মা"।

—দেখা যাবে।

—ধরো যদি তখন না বাঁচি, তাহলে সে যেন না জানে জন্ম দিয়ে

মা মরে গেছে, কেমন ?

—ছি ছি অহনা !

—না দিদি ! অনেক পেলাম, তোমার ভালবাসা, স্বামীর যত্ন, ছেলের জন্যেই এনেছিলে, মনে হয় বাঁচব না।

—শরীর তো ভাল আছে। আর দু'মাস সবে ! কারে তো বলিনি এখনো।

—কেমন গর্ভ দিদি ? কোন অরুচি নাই, কোন খাবার বস্তু দেখলে বমি আসে না।

—সে তো ভালই রে। মা খাবে দাবে, ছেলে হবে সা'জোয়ান।

—তোমারও বিপদ। কারে শুধাতেও পার না, তিন মাস না গেলে বলতে নাই।

—আর বলি ? একেই তোরে দেখে থেকে হিংসা, যতুক তত্ত্ব দেখে হিংসা, তা বাদে সে বিদেশে গেল, হিংসা। একথা শুনলে মানুষ হিংসায় জ্বলবে।

অহনা শিউরে উঠল। গর্ভে সন্তান এসেছে, এ সংবাদ জানার পর থেকে অহনার মন বড় অন্যরকম। সলতেটি যেন বেঁচে থাকে, সুসময়ে সুপ্রসব হয়। গণপতির বড় আশা ছেলে কোলে করবে।

আর কনকাও অনেক যত্ন করছে তাকে, এ ঋণ অহনা ভুলবে কি করে ?

এভাবেই যদি চলত, তাহলে তো একাদশ বঙ্গাব্দে বেনে বউয়ের কাহিনী অন্যরকম হত। বেনেবউ পাখি অহনার কান্না কণ্ঠে তুলে নিয়ে ডেকে ডেকে বেড়াত না।

॥ ১১ ॥

কনকার স্নেহমমতার বাতাবরণ একদিন ছিঁড়ে গেল। অহনাকে দাঁড় করিয়ে দিল অগ্নিবলয়ের মধ্যে। সহসা অহনা সব হারিয়ে ভিখারিণী।

অথচ, পরে অহনা কত কত ভেবেছে। দিনটি কি কোনো দুর্লক্ষণ নিয়ে শুরু হয়েছিল? তা তো হয় নি।

বরঞ্চ সাতসকালে উঠেই নীলকণ্ঠ পাখি দেখেছিল অহনা।

—অ দিদি, ওই দেখ, ওই দেখ!

—ও মা, এ যে সুলক্ষণা পাখি গো! নমস্কার কর্ অহনা। এ পাখি গিরস্তকে ধনসম্পদ দেয়।

—সত্যি?

—সত্যি, সত্যি, সত্যি।

সকালে দুই জা ক্ষার খইলে স্নান করেছিল।

অহনার ননী হেন চামড়া মাজতে মাজতে কনকা বলেছিল, তিনমাস না পুরলে মানুষকে বলা যাবে না। চারমাসে পড়ুক, বলে কয়ে জেনে নেব কি ভাবে রাখব তোকে।

অহনা গভীর বিশ্বাসে বলেছিল, তুমি আমাকে যে যত্ন করো, মা করতে পারে নি।

—মামীর সঙ্গে আমার তুলনা?

—সত্যি বলছি দিদি, মিছে বলব কেন?

গভীর ও আন্তরিক আবেগে অহনা বলেছিল, পরজন্মে যেন তোমার মেয়ে হয়ে জন্মাই। সত্যি দিদি, "মা" ডাকতে সাধ যায়।

—কেন এমন মায়ায় জড়াচ্ছিস বলতে পারিস? চল্, খাবি চল্। দুধ মুড়কি ভালবাসো, ঘন করে জ্বাল দিইছি দুধ। কাঁথার মত পুরু সর পড়েছে, নারকেলের ছাঁচ, চল্!

দুই জা পাশাপাশি বসে খেয়েছে, গল্প করেছে, হেসেছে। খেতে খেতে কনকা বলেছে, অ পিসি! তেঁতুল রোদে দিতে ভুলো না গো! আর দেখ! তোমার ঘরে দুধ মুড়কি রেখে এসেছি।

—তোর সবদিকে নজর বউ!

আসলে, মনে মনে আতাপিসি অহনার কাছে বড় কৃতজ্ঞ। অহনার বাবা মাসে মাসে তত্ত্ব করেন। ফল, মিষ্টান্ন, আচার, বড়ি, মশলা, মাছ, দই, ক্ষীর।

অহনা বলে, দাও দিদি, পিসিকেও দাও। না দিলে ওনার নজর লাগবে।

কনকা প্রথমটা খুশি হত না। কিন্তু এখন অহনার দৌলতে সে পাড়ায় মাসে মাসে বিলোয় এটা-ওটা। বলে, মামীর হুঁশ কত! ওনার দাসী সব্যদা বলে, এ তো আমার ভাগ্নীকে পাঠাই। তার বাপ-মা কর্তব্য করে নি, আমি করি।

কনকা এখন প্রায় বলে, আগে যদি জানতাম আমার আপন বলতে মানুষ আছে, তবে কি শাউড়ির কাছে এত খোঁটা খেতাম? আহা! তিনি থাকতে যদি বেন্যা ত্রিনয়নী যেত! বড় ভাল হত।

অহনা সদুঃখে বলে, কি লাভ হত? ধরো যদি কোষ্ঠীতে ফাঁড়া না থাকত, কবে বাবা কোথায় বিয়ে দিতেন।

—এমন বরটি পেতিস না।

—এমন দিদি পেতাম না।

দুপুরে দুজনে বসে গল্প করে করে খেল। কনকা এমন অনুগত শ্রোতা পায়নি অনেককাল। কত গল্প, কত গল্প।

—কাঁটা লেগে কাপড় ছিঁড়েছে, লুকিয়ে সেলাই করতাম। হঠাৎ অতিথি এসে পড়ল, শাউড়ি বলে, তুই রাঁধ গে। সব্যদা বলত, সন্তান হয় নি, বাঁজী, খেয়ে খেয়ে গতরে তেল জমেছে।

—কখনো ভালবাসে নি?

—বছর কয়েক, এতটা খরো খরো ব্যবহার ছিল না। তবে বোন! বে' দিয়ে বাপ হাত ধুয়ে ফেলে দিল⋯না তত্ত্ব, না তাবাস,

না একবার খোঁজ নিল। এদেরই বা কি বলব বলো? বড় বউ, মেজ বউয়ের বাপ তো কয়েক বছর তত্ত্ব করেছে।

—বা রে! তোমার বাবা দেশান্তরী হয়ে গেলেন, সেটুকু বুঝবে না?

—কেউ বোঝে না রে! নাও, লেজাটা খাও, তুমি যে ভালবাসো!

—মাছ এত খেতাম না। খেতে শেখালে তুমি। আমার মা বড় মাছের ভক্ত।

—মামাকে খাইয়েছি। ছেলে নে' মামার বাড়ি যাব। মামীকেও খাইয়ে আসব।

—অত কাঁথামাদুর কাচলে, আমাকে কাচতে দিলে না।

কনকা বলে, আমার যে বড্ড বাতিক রে!

এই যে বালিশ রোদে দিইছি। সেলাই খুলব। তুলো হাতে পিঁজে আবার ভরব, বালিশের মুখ সিঁয়াব।

—বিয়ের বালিশ নতুন বটে, কিন্তু এত তুলো ঠেসেছে যে শক্ত যেমন লোহা!

—ঠিক করে দেব। চারটি তুলো বের করে নেব, বালিশ নরম হবে।

—বাপ রে, এত খেলাম যে ঘুম পাচ্ছে এখন।

—আমার খাটে শুয়ে থাক্ গে যা। অ পিসি! দাওয়ায় একটু বোস না গো!

—তোর এই প'ষ্কের প'ষ্কের বাতিক যে কবে যাবে! বলি, ঘুমও কি পায় না?

—ঘুমোতে দিত তোমাদের বউঠান? অন্য বউরা খেয়ে দেয়ে ঘরে গেল, আমার ওপর হুকুম হ'ল, মাচায় বড়ি শুকোচ্ছে, পাখি তাড়া। নয় এটা কর, নয় ওটা কর। অভ্যেস এমন হয়েছে পিসি! কাজ খুঁজে খুঁজে মরি।

অহনা মুখ আঁচিয়ে পান মুখে কনকার ঘরে শুতে গেল। কেমন যে শরীরের অবস্থা! খালি আলিস্যি আসে, খালি ঘুম পায়। মা

বলে, অহনা পেটে থাকতে মা শুধু ক্ষীর-পায়েস-মিষ্টান্ন খেতে ভালবাসত। মা দুধের জিনিস খেত বলে অহনার রং এমন হয়েছে।

না, অহনার মন থেকে কনকা বিষয়ে ভয় কেটে গেছে। অনেকদিন হল কনকার ওপর খুব ভরসা এসেছে। ঘুমে এলিয়ে পড়তে পড়তে অহনার মনে হল, দিদিকে বোধহয় কেউ সত্যি সত্যি ভালবাসে নি।

কিন্তু...আমি...তোমারে...খুব...ভালবাসি দিদি!

অহনা ঘুমিয়ে গেল।

পিসি একটি কণ্ঠি নিয়ে দাওয়ায় বসে। আহা গো, এমন খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গড়াতে সাধ যায় বইকি। চৌকিতে মাদুর পাতা, একটি বেজায় শক্ত বালিশ! জানলা দিয়ে দক্ষিণের বাতাস আসে। ঘুম এসে যায়।

তা তো হবে না।

কনকা বলল, ঘুমের কথাও ভেব না। সর্বস্ব রোদে দিয়েছি। কাক হাগবে, মাদুর কাঁথার নিচ দে' কুকুর বিড়াল হাঁটবে। না, না, সে ভারি অলক্ষণ। এখন সাবধানে থাকতে হয়।

—কি হ'ল ?

—বান্যা ঘরে নেই, আমার ঘাড়ে সংসার। সাবধানে না থাকলে...

পিসি বলল, সেই তো কথা।

হঠাৎ চুপচাপ সব। নিঝঝুম দুপুর। গাছপালায়, বাঁশবনে বাতাসের প্রবাহে পাতার মর্মর। কোথাও কুবো পাখি ডাকে কুব-কুব-কুব!

পাখপাখালি দেখতে পারে না কনকা। ভারি ময়লা করে কনকার উঠোন।

কনকা বালিশ নিয়ে বসল।

এমন নিরিবিলি মধ্যাহ্নে মেয়েছেলে কাজ মিটিয়ে নিদ্রা যায়। কনকার তো দুপুরের ঘুম বহুকাল বিসর্জন। দুপুরে সে আপন মনে পয়পরিষ্কার করে, নয় নারকেল পাতা চাঁছে, নয় কাঁথা সেলাই করে।

সব যদি ভাল হয়, সে জন সময়ে ফেরে, ঠাকুরকে রুপোর বেল-পাতা দেব। ঘরে ভাগবদ পাঠ করাব। অহনার তিন মাস না পুরলে কনকা মুখ খুলতে পারবে না। সে ভারি অলক্ষণ। চার পুরে পাঁচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিনয়নীতে রেখে আসবে।

সেখানে মামী বুঝে নিক। তারই তো মেয়ে। গঞ্জ জায়গা, ভাল ভাল পার্থি আছে, সুপ্রসব করাবে। ছেলেটি বা মেয়েটি তিন মাস হলে কনকা বাড়ি আনবে।

মেয়ে হলে বা মন্দ কি। প্রথমে মেয়ে হওয়া না কি ভালো।

হ্যাঁ, জোড়ামাসে সাধ দেবে কনকা। পঞ্চামৃত খাওয়াক মা, পাঁচটি সন্তানবতী সধবাকে ডেকে। আট মাসে কনকা সোনার লবঙ্গ-ফল বালা (অহনার ভারি শখ), স্বর্ণবর্ণ রাঙা পাড় পাটের শাড়ি, আর মাছ-চাল-ঘি-মিষ্টান্ন নিয়ে যাবে, রেঁধে বেড়ে সাধ দেবে।

সন্তানটি সুপ্রসব হোক। কনকা কোলে তুলে নেবে। অহনা হবে ছোট মা। একটা কেন, তিন চারটে হোক না। ঘর ভরে উঠুক। বাড়িতে পাঠশালা বসাবে কনকা।

কিন্তু বান্যা কি সময়ে ফিরবে? গদা যেয়ে সম্বাদ এনেছে দেরি আছে ফিরতে। শ্বশুর জামাই একসঙ্গে গেছে।

মামা বান্যাকে পেয়ে যেন ছেলে পেয়েছে। যত কাজের কথা, জামাইয়ের সঙ্গে।

সাধে কি বেনে পাড়া হিংসেয় রি রি করে? গণপতি বেনে, যাকে কেউ আমলই দিত না, সে এখন রুপোর বাটায় পান খায়। খাগড়ার কাঁসার থালা বাটি গেলাসে ভোজনে বসে। গয়ার পাথরবাটিতে দই খায়। কাশীধামের নরম আসনে পুজোয় বসে।

কনকার নাম করে মামী তত্ত্বতাবাস করে। কত আর সয় বুকে? জ্বলুক, জ্বলে মরুক। পরের ভালো দেখে কনকাও একদিন জ্বলেছে। আসল সুসংবাদটি বললে তো সবাই মুচ্ছো যাবে।

কেন তিন মাস না গেলে বলা যাবে না? সইয়ের শাউড়ী বলে, তিন মাস অব্দি বা-বাতাসে ডাইনি-পিশাচী ঘোরে। গোপন রাখতে

হয়। না, কনকা নিয়ম ভাঙবে না।

পাঁচমাসে পাঠাবেই। কি থেকে কি হবে, সে কি কনকাই জানে ?

মা গো ! বরকনের নতুন বালিশ যেন তুলো ঠাসা। কনকার হাতেসাঁয়ানো একটি বৈরেগীর ঝোলা আছে। সে ঝোলাতে কনকা তুলো জমায়। অহনার বালিশ থেকে কনকা খানিক তুলো বের করে ঝোলাতে ফেলল। বালিশের মধ্যে আঙুল চালিয়ে তুলো চালাচালি করে দিয়ে বালিশের মুখ সাঁয়াল। না অহনা, এখন আর তোর ঘাড়ে ব্যথা হবে না।

গণপতির বালিশের মুখ খুলে তুলো বের করল। কি ঠেসে তুলো দিয়েছে বালিশে। আঙুল চালিয়ে তুলো নেড়ে চেড়ে দিতে দিতে, হাতে কি একটা ঠেকল।

ছোট, এতটুকু একটা লাল কাপড়ের পুঁটলি। চারদিক সেলাই করা।

কি আছে ভেতরে।

কনকা দাঁতে সেলাই ছিঁড়ল।

কটুগন্ধ ভষ্ম !

কনকা কেঁপে উঠল। অস্ফুটে "মা গো !" বলে ও দেয়ালে হেলান দিল।

মনের ভেতর ঝড় বয়ে যায়। এ তো কোনো কাঁউর কামিখ্যে জানা গুণীনের দেয়া জিনিস হবে।

কটু গন্ধ, কটু গন্ধ।

তেগুণার অষুদ বাকল সে জন্যেই খাটে নি। কি করতে বাকি রেখেছিল কনকা ? জোড়া অশথপাতায় দুগাপিদিম জেবলে কাজল পেড়েছে, পরেছে। গণপতি চেয়েও দেখে নি। তেগুণার দেয়া অষুদ বেটে সুক্তোয় মিশিয়ে খাইয়েছে। আরো কত, আরো কত !

গণপতিকে অষুদ যে করেছে, সে নিশ্চয় কনকার মৃত্যু ঘটাবে। অহনা, অহনা আটঘাট বেঁধে সব ব্যবস্হা করে তবে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল।

অহনা বিয়ে হয়ে এল, তারপর? তারপর? এ কি ভীষণা মেয়েমানুষ গো! স্বামীকে বশ করতে পারো, সতীন কখনো বশ হয়?

কনকার সঙ্গে ছায়ার মতই লেপটে থাকে। কনকাকে "দিদি" বলতে অজ্ঞান হয়।

সব, স—ব ছলনা নিশ্চয়।

কনকা পুঁটলিটি নেকড়ায় আতিপাতি বাঁধল। জোরে জোরে নিশ্বাস টানল। নাকের পাটা ফুলছে, চোখ ঘুরছে, সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, মাথায় আগুন! মাথায় আগুন!

নিশ্চয় তার বিপদ কার্মনায় এই ভষ্ম তৈরি হয়েছে।

কি সে বিপদ? কেমন বিপদ?

এমন যদি হয়, সে কানা হয়ে গেল? অথবা পঙ্গু? নয় যদি মরেই গেল?

তেগুণার কাছে যেতে হবে, তেগুণা। দেবদেবতা কি করতে পারে মানুষের? মানুষ চায় তেগুনার মত মানুষদের। যারা পলকে প্রলয় ঘটাতে সক্ষম, মানুষকে বাণ মারতে, তার ক্ষতি করতে পারে।

সেদিন তেগুণাকে কত না গাল পাড়ল কনকা! রাগে গরগর করে বিষ চোখে তেগুণাকে বিঁধে বলল, কোনো বিদ্যা নাই তোর, নিখ্যমতা তুই! যা চাইলি, দিলাম। যা বললি, সব করলাম। কোনো কাজ হ'ল না। স্বামী যখন সতীন পানে চায়, দুই চোখে প্রেম ঝরে। আমার সাথ যেটুক কথা, তা সতীন লয়ে। ওরে দেখো, চরণে রেখো, দুঃখ কষ্ট দিও না।

তেগুনা বলছিল, তা তুমি বা কেন সতীন লয়ে ঢলে মরছ?

—সে⋯অন্য কথা।

এখন তো বোঝাই যাচ্ছে, সবই অষুদের গুণ! নইলে সতীনের জন্যে বুক কাঁদে, এমন হয়? সতীনকে বুকে রাখতে ইচ্ছা যায় নিশিদিন?

এ তো স্বাভাবিক নয়।

এখন কনকা জানছে এই অষুদ তেগুণার অষুদকে পরাজিত করেছে। কনকা স্বভাব ভুলে অন্য মানুষ হয়েছিল। এখন সে আগের মত নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্তা বাঘিনী যেন।

এলো চুলে গেরো দেয় না কনকা। উঠোনে বিছানা মাদুর শুকাচ্ছে, তা ভুলে যায়। ছেঁড়া তুলো মাথায় মুখে, তাকে কেমন দেখাচ্ছে তা মনে থাকে না।

আতাপিসি কি বলে, কানে যায় না। খর রোদে উঠোনে নেমে এসে কনকা গর্জে ওঠে, করাচ্ছি অষুদ! আজ তোরে কেটে তোর রক্তে চান করব, তবে আমি কনকা!

পুঁটলিটি চেপে ধরে সে বাঁশবনের পথে দৌড়য়, যেন চৈত্রের ঘূর্ণী হাওয়ার বেগে। চুল ঝাপটায়, আঁচল ওড়ে।

গভীর, গভীর সন্তোষে মুখ তোলে তেগুণা। কনকার তিরস্কারে সে বড় অপমান হয়েছে গ্রামে। তার মন্ত্র বা অষুদ জ্ঞান যে ভূয়া, তাই বলছে সবাই। এ সবের মূলেই কনকা। কনকার সতীনপ্রেম। সতীন সতীনকে, বিমাতা সপত্নী সন্তানকে, সপত্নীসন্তান বিমাতাকে, শাশুড়ি বেটার বউকে ভালবাসলে সেটা তেগুণার রাজ্যে অনিয়ম।

উল্টোটা নিয়ম। এ নিয়ম তো তেগুণার তৈরি নয়। এ নিয়ম তো সংসারে দেখাই যায়।

মুকুন্দ ঠাকুর না কি তারে পঞ্চ ডেকে গাঁ-খেদা করবে। করে দেখুক কেন? ঠাকুর না কি বলেছে, তেগুণা যদি দুনিয়া বশ করে থাকবে, তবে সে কেন ভাঙা ঘরে থাকে, গেরো দেয়া কানি পরে, মাথার তেল পায় না?

তেগুণা এ সব শুনে কিছুকাল বড় মরমে মরে আছে। হায় আমার ক্ষমতা নাই গো! এ কথা তার নিজেরও মনে হচ্ছে। আর, তার এ মনোবিকলনের জন্য কনকাই দায়ী। সে কেন অহনাকে বুকে আগলে রাখে?

কনকা যখন ঝড়ের মুখে বাজপাখির মত তেগুণার উঠানে আছড়ে পড়ে, তেগুণার মন বড় ঘা খায়। সুসংবাদ? কুসংবাদ? কি সংবাদ? গণপতি বেনের বড় বউয়ের কি তেগুণাকে দরকার?

—কি হল....বান্যানী?

কনকা হাত বাড়িয়ে দেয়।

—তুমি ওই উঠানে গাছের ছেঁয়ায় বস।

—আমি....

—কথা বল না।

অনেক, অনেক ক্ষণ যায়।

তারপর তেগুণা চোখ তোলে।

—আঁতুড়া ছেলার নখ, কুনো সতীনের মড়ার চুল, ধনেশ পাখির ঠোঁট, মাদী কাঁকড়ার দাঁড়া, আরো সর্পকণ্টকী কী, নখমাংসী, নানান লতাপাতা রাতে লেংটা হয়ে তুলে....ভষ্ম করে করে....সে ভষ্মরে কাক-বিড়াল-শকুন-কুকুরেরে খাইয়েছে....তারা মরেছে....আবার তাদের নখ লিয়্যে ভষ্ম করে....

—এ কি?

—তুমার মিত্যুবাণ!

—মিত্যুবাণ!

—লয় তো কি? আখুন চিন্তা লাই....কিন্তুক উয়ার পেটে বিটা এলো....সি বিটা প্যাটে পাঁচমাস, বান্যা তোমারে খ্যাদা করব্যে। আর বিটা জনম লিয়াল তো তুমি মরবে....ই কুনো পিচাশসিদ্দ গুণীনে করেছে....

—আমি যদি ওরে মারি?

—তুমি তেখুনি মরব্যে, উয়ার আগে।

—পেটের ছাঁ যদি লষ্ট করি?

—অষুদ করলে তুমি মরব্যে!

—তা হলে কি করব? মা গো! কোথা যাব আমি? কি করব?

—আপনা হতে গা খসলে তুমি নিভ্ভয়····

—তা খসে কখনো ? মিত্যুভয়, মিত্যুভয় গো মা ! কোথা হতে ডান আল্য, আমার রক্তে চান করে পাটে বসবে !

—ই পুঁটলি ছিল কুথাক বান্যানী ?

—বান্যার বালিশের তুলায় ।

—সে জানে না····

—এখন বুঝি ! ত্রিনয়নী গেল আর ভজে গেল ! আরে ! যে মেয়েরে কেও বিয়া করে না, তার তরেই বান্যা যেমন নাকে দড়ি মইষ ! আর ঘরে আনল ! একদিন বাদে একদিন ঘরে যায়, বান্যা বলে কাঠের পুতুল !

তেগুণা ঘোলাটে চোখে গলিত দন্তে হাসে, আর কি বলবে ? বান্যা কি আপনা হতে বলে ? তারে বলা করায় ।

—আর নিমেষে····

কনকার মনে বিদ্যুচ্চমকে সাবধানতা জাগে । না, বলবে না সে অহনার গর্ভের কথা । অহনাকে হেঁচকে····মেরে····পাট পাট করে···· খসে গেলে বলবে জানি না তো ? মৃত্যুভয় বড় ভয় । কনকা বাঘিনী হয় ।

তেগুণা বলে, আমার অষুদ····

—তখনো কাজ করে নাই, এখনো করবে না । নে ! এ অষুদ গনে দিলি····

কানের মাকড়ি খুলে ফেলে কনকা, ছুঁড়ে দেয় তেগুণাকে । তারপর চিল চিৎকারে দামিন্যার আকাশ চিরে পুঁটলির নেকড়াটি হাতে নিয়ে বলতে থাকে, অহনা আমারে মারা করাবে বলে পিচাশ্যা অষুদ করেছে গো····বান্যার বালিশে সে অষুদ গুঁজা ছিল গো ! পিচাশী আমারে মারা করাবে গো····

যেমন বেগে এসেছিল, তেমন বেগেই ও ছোটে বাড়ির দিকে । উঠোনে মেলে রাখা কাঁথা কাপড় ফেলে দেয়, আতাপিসি তার চেহারা দেখে "বড় বউয়ের কি হল গো" বলে ডুকরে ওঠে ।

ঘুমন্ত অহনার চুল ধরে তাকে মাটিতে ফেলে কনকা, ঝাঁটা দিয়ে মারতে থাকে।

অহনার "বাবা গো, মা গো", চীৎকারে কান পাতে না সে, টানতে থাকে চোরকুঠরির দিকে।

—অ দিদি গো, আমার····

ভিড়, উঠোনে ভিড়। আশপাশের বাড়ির বউমেয়েরা ছুটে আসে।

সরস্বতী ছুটে এসে কনকাকে ধরে।

—পাগল হলি তুই? এমন সময়ে এই গেলি, এই এলি? অমন করে মারে?

কনকা এখন বাঘিনী বটে।

—ওরে শুধাও এটা কি? কিসের ভষ্ম পুঁটলি সিঁয়ে বান্যার বালিশে রেখেছিল?

—জানি না····দিদি····

কনকা পা ঠুকে বলল, আমি জানি।

পড়শীদের বলল, তোমরা জান? জান না। আমি তেগুণার ঘরে দৌড়ে যেয়ে গনিয়ে এলাম। এটা হল আমার মিত্যুবাণ! পিচাশসিদ্দ কেউ করেছে। পেটের ছেলা পাঁচমাস, স্বামী আমারে খেদা করবে। ছেলা জন্মাবে, আমি মরব।

—হাই গ রে মা!

কনকা সরোদনে বলে, পালটা অষুদ করলে আমি মরব, এরে কেটে রক্ত খেলে পিপাসা যায়, এরে মারলে মরব, পেটে ছেলা নাই! থাকলে অষুদে গা খসালে মরব। কেমন মিত্যুপাক দেখ!

অহনা আঁচল গুছায়, মাথায় কাপড় দেয়, বাহুতে, কাঁধে, গালে মারের দাগ, সে করজোড়ে বলে, আমি কিছু জানিনা গো! বিশ্বাস করুন আপনারা!

যদুনন্দনের বোন বলে, তেগুণা কি মিছে বলবে?

কনকা বলল, তোমরাই বল?

সরস্বতী শাশুড়ি বলে, কনকা! তুমিও অনেক অষুদ করেছিলে বাছা।

—কিছু খাটে নাই গো খুড়ী!

—তুমিই সতীনসোয়াগী হয়েছিলে, যা কেউ হয় না। যা নাই ভুবনে, তা দেখালে জীবনে।

—সোয়াগ কি ছিল মনে? সোয়াগ যে এল, তা ওর অষুদের গুণে।

—অষুদটি নিয়ে কারোকে কিছু না বলে পগাড়ে নিয়ে ওর উপর মুতে দিতে, বেকল হত। এখন যা হবার তা হয়ে গেছে, মেরে ধরে কি করবে? পাড়ায় ক্যাল্লা বাড়িও না বাছা! আর বড় বউ! ছোট বউ! বিষপুঁটলি কনকার ঘরে বা ঘাটে একবার পা দিবি না। কেমন অষুদ, কি তার ক্ষ্যামতা কে জানে? এমন অষুদের কথা জানি নি বাছা!

হরিমতী খনখন করে বলে, আমার বাপু সন্দ ছিল। রাজার ঝি এমন ঘরে দিল কেন? কনকা! ত্রিনয়নীর বান্যারা অষুদ বিষুদ জানে খুব!

—আমার কি হবে গো?

—বাঁজা আছে, বাপের ঘরে পাঠ্যে দে!

সবাই চলে যায়।

কনকা হিসহিস করে বলে, আর কিছু না পারি, মারব আর শুকোব।

—দিদি গো....

অহনার ভীষণ, ভয়াকুল আর্ত চীৎকার দিকে দিকে চলে যায়। কনকা ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বাইরে থেকে শিকল তুলে দেয়।

বিকেলের মধ্যে দামিন্যার কাকপক্ষীও এ খবর জেনে যায়। গ্রামবাসী কৌতূহলে নড়েচড়ে ওঠে। মুকুন্দর বউ বড় কাতর হয়। কিন্তু মুকুন্দ বলে, ঘরোয়া বিবাদে কে কি করবে? এমন নয় যে স্ব-সমাজ।

—ওদের সমাজ নেই ?

—শুনি তো আছে। কিন্তু গণপতিই নেই। কেউ সমাজের কাছে যায় তো প্রতিকার হয়। কিন্তু মেয়েছেলের ব্যাপারে কে কি বলবে ? আর দেখ না! কাল হতে হয়তো এমনটা করবে না।

মুকুন্দর বউ মনে মনে বলল, যেন না করে, হে ঠাকুর, যেন না করে। নির্দোষীর কান্না শুনতে পারি না। পিচাশের মত কেউ কারে মারে, সইতে পারি না। হে ঠাকুর! অহনারে বাঁচাও।

কিন্তু একাদশ বঙ্গাব্দে ঠাকুরদেবতার কান নেই, হৃদয় নেই, ক্ষমতা নেই।

তাই যখন তখন শোনা যায় আর্ত মিনতি, মেরো না দিদি গো! আমাকে ছেড়ে দাও। বন্ধ করে রেখো না গো!

বেনে পাড়া স্তব্ধ। কনকা ও অহনা দু'সতীনে চুলোচুলি কলহ হত তো তারা বুঝত। সে তারা জানে। সতীন থাকলে কোন্দল হয়। স্বামী থাকে সুয়ো ঘরে, সে দুয়োকে ছেঁচে। স্বামীর মন সদয় করার জন্য, সতীনকাঁটা ওপড়াবার জন্য মেয়েরা অষুদ খোঁজে।

এসব হয়। এসব দামিন্যার চেনা জিনিস।

কিন্তু কনকা যা করছে, তা কেউ দেখেনি। এজন্যই এটা লোককে অস্বস্তিতে ফেলেছে, যে অহনা কখনো গাল দিচ্ছে না, পালটা মারছে না, কিছু করছে না।

সরস্বতীর শাশুড়ি বললেন, খেতে দেয় ?

আতাপিসি বলল, চুপ, চুপ!

—খেতে দেয় ?

—ভাঙা পাতরে এক মুঠো ভাত।

—রোজ মারে ?

—চলতে ফিরতে।

—তুমি তো পিসি হও····

—চুপ চুপ!

তারপর বলল, আতি্যসুয়ো দেখালে কেটে ফেলবে। বঁটি নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। আমি যখন ধরে ধরে ঘাটে নিই, লুক্যে মুখে এট্টু গুড়, এট্টা নাড়ু গুঁজে দিই। আমার কাছেও তো থাকে না কিছু।

—রাতের কান্নাটা যে সয় না আর।

—তোমরা পাঁচজনা যাও না।

সম্ভবত গিয়েছিলেন সরস্বতীর শাশুড়ী। কেন না সেদিন শোনা গেল, এত আস্পদ্দা গঙ্গাজলের শাউড়ির? সে আমাকে আদ্দব দেয়? সব তোর জন্যে।

সপাৎ সপাৎ মারের শব্দ।

অহনার আর্ত কান্না।

একে এই দুঃসহ পরিস্থিতি, তায় ব্যবস্থা করো, ব্যবস্থা করো বলে মুকুন্দর বউ মুকুন্দকে পায়ে ধরতে বাকি রাখল। মুকুন্দ বলল, কেউ না আগায় তো আমি আগাব। আমারও অসহ্য হয়েছে।

এখন দামিন্যার রাতের আবহসংগীত এক অসহায়া নির্যাতিতা বালিকার করুণ কান্না। এ কান্না পাড়ায় পাড়ায় ঘুম কেড়ে নেয়।

বসুভূতি দত্ত নিজেকেই বললেন, রমণী যখন নিগৃহীতা, তার কান্নার যখন প্রতিকার হয় না, তখন দেশের দুর্দিন আসন্ন।

দত্তজায়া বললেন, শুনতে পাই না, সবাই বলে তাতো জানি।

দত্তজায়া বড়ঘরের মেয়ে, তেজস্বিনী, সংসারে সাম্রাজ্ঞী। তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, তোমরাও তো অক্ষ্যামতা হয়েছ। হোক সোনার বেনে, সমাজে বাস করে, না জঙ্গলে? ডাকা করাও তাদের, বলো এমন চলবে না।

—তাই ডাকা করাব।

—ডাকা করাবে, ব্যবস্থা করতে পারবে?

—দেখব, চেষ্টা করব। বিপদ হল, গণপতি এখানে নাই। পুরুষহীন গৃহ, সতীন সতীনরে নির্যাতন করে। গণপতির বড় বউ কারেও মানে না।

—তবু দেখ।

—হ্যাঁ গৃহিনী, দেখব।

—দেরি করলে অহনা তোমাদের মুক্তি দিয়ে যাবে। তখন আর কাঁদলেও ফিরবে না।

অহনার চোখ এখন দিন বা রাত্রির প্রভেদ বোঝে না। প্রভাতে দ্বার খুলে আতাপিসি তার হাত ধরে ঘাটে নেয়, স্নান করায়, কাপড় ছাড়ায়, দাওয়ায় বসিয়ে রুক্ষ চুলের জল মোছে। এখন তো দিন। অহনার কেন মনে হয় এটা রাত?

চুল আঁচড়াতে যায় আতাপিসি, অহনা হাত তোলে। মাথায় দুরন্ত ব্যথা গো! কাঁকই বিঁধে!

গায়েও কালসিটে, চামড়া ফাটা ফাটা। পিঠে মারের দাগ বড় বেশি, কেননা অহনা পেটটি বাঁচায়। কিন্তু অহনা এখন জানে, সন্তান জন্ম অবধি সে বাঁচবে না।

জানে কোষ্ঠী মিথ্যা, গণনা মিথ্যা, জ্যোতিষ মিথ্যা। এও জানে, গণপতি সংবাদ পেলে পাখি হয়ে উড়ে এসে তাকে বুকে আগলে নিয়ে যেত নিরাপদ আশ্রয়ে, কিন্তু গণপতির সঙ্গে তার দেখা হবে না।

ঘরের দেয়ালে কাঁকই দিয়ে লিখেছিল "তুমি যবে হতে দেশান্তরী, আমার চক্ষে দিবানিশি সমান আঁধার"। সেই লেখাটির গায়ে মাথা রেখে ও চোখ বুজে বসে থাকে। কানা ভাঙা পাথরে ভাত আর কলসে জল রেখে যায় আতাপিসি। কখনো খায়, কখনো খায় না। জানলা দিয়ে আকাশ দেখে।

ওই পুঁটলিতে কোন অষুধ ছিল বটে? মা! মা যে বড় কাতর হয়েছিল। তুমি কাতর হলে অহনার জন্য মা! কিন্তু অহনা তো আর থাকবে না। কেন না পেটের ভিতরে ভ্রূণটি কি আর আছে? সেটি যদি না থাকে, অহনার বেঁচে লাভ?

এভাবেই বসে থাকে অহনা, কনকা ঢুকলেও মুখ তোলে না। এই নির্বাক ও নিঃশেষ আত্মসমর্পণ এ এমন এক অপরিচিত ব্যাপার, যে কনকার উদ্যত হাত নেমে আসে।

অহনা তার দিকে অপলক চেয়ে আছে।

—খাস নাই কেন ?

অহনা নিরুত্তর।

—না খেয়ে মরে আমারে মারা করাবি ?

অহনা নিরুত্তর।

কনকার বুক ধড়ফড় করে। না খেয়ে যদি মরে যায় ? ও মরার আগে তো আমি মরব। মৃত্যুবাণ! মৃত্যুবাণ!

কনকা ডাকে, আতাপিসি!

আতাপিসি নীরবে এসে দাঁড়ায়।

কনকা প্রাণভয়ে বলে, আমারে নয় বাণ মেরেছে। তোমার কি হয়েছে ? এরে তপ্তভাত ব্যঞ্জন এনে খাওয়াও।

—খাবে কোন মুখে ? ঠোঁট ছেঁচা, দাঁত ভাঙা, গলার নালী টিপে টিপে অন্ননালী বন্ধ। জল বিনা কিছু খেতে পারে ? কি তোরে বুঝাল তেগুণা, মহাপাপ করলি ?

কনকা রাগতে গিয়েও দেখে ভয় তাকে বেড়ে ধরেছে। বলে, তপ্ত দুধ ঢোকে ঢোকে দাও।

—আমি খাব না।

অহনা শুয়ে পড়ে। চোখ বোজে।

আতাপিসি কাছে এসে বসে।

—দেখি মা! একটু দুধ দিই ?

—না পিসি, আমারে খেতে নেই যে!

এত মিষ্টি করে বলে অহনা, যে পিসির বুক ফেটে যায়।

—খা মা, খা! আজ তো পিচাশীর বুক কাঁপবেই। পঞ্চে সমাজের ডাক হয়েছে। উয়ার শাস্তি হবে।

অহনা ঘুম ঘুম গলায় বলে, কার ?

—কনকার।

—কেন ?

—তোরে জীয়ন্তে ছেঁচছে বলে....

—কি লাভ!

—দুধটুকু খা মা!

—তুমি জল দাও।

—দেই, জলে দুধে দেই⋯

দু ঢোক খেয়েই অহনা ঘুমিয়ে যায়। সব হালকা হালকা যেন, সে যেন কোথায় চলে যাচ্ছে। মা ডাকে, অহনা⋯গণপতি ডাকে, বউ⋯অহনা ঘুমায়। আমি ঘুমাই গো! আমারে ডেক না।

পঞ্চে বেনেদের ডাক পড়ে, আর বেনেসমাজের মেয়ে বউ কনকার উপর আক্রোশে ফেটে পড়ে। কনকার অন্ধ সমর্থক সরস্বতী কর্কশ কণ্ঠে বলে, বাঁজী! আঁটকুড়ী! সতীন নাই কার ঘরে? অষুদ-পালা করে না কে? বিবাদ কলহ হয় না কোথায়? কিন্তু কোনদিন পঞ্চ ডেকেছে গ্রামে?

হরিমতী গভীর সন্তোষে বলে, বেনেসমাজের পঞ্চ নয়, মহা পঞ্চ! সকল সমাজ!

যদুনন্দনের মা বলে, রক্তখাগী! তোর কারণে যদি সমাজে জরিমানা হয়, ধোপানাপিত বন্ধ হয়, তাহলে যত ঘর আছি, তোরে দশ ঘা করে ঝাঁটা মারব।

কনকা বিমূঢ়, বাকরহিত।

যদুনন্দনের বউ গঙ্গা বলে, পিচাশী! এখন সন্দ করি, গ্রামে কোলের কচিকাঁচা না জন্মিতে মরল যে কটা, তোর বিষে মরেছে।

—কে বলে এ কথা?

গঙ্গা মলশুদ্ধ পা ঠুকে বলে, বলি যদি? কিছু করতে পার? তেগুণার ঘরে ঘনঘন তুইই যাস। আমরা যাই?

এভাবে উঠোনে এক স্মরণীয় কলহ বাধে। অহনার নৈশবিলাপ ও কান্না অনেক দিন ধরে অনেকজনের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। দু'সতীনের ভালবাসাবাসি অসহ্য লাগত সত্যই। কিন্তু কনকার এ ছিন্নমস্তা রূপ তো সমাজকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। আর অহনার কান্না।

—হিংসা করলি কারে? স্বর্গের দেবকন্যা হেন রূপ, জলের

মত শীতল, রাণী হবার মত এক মেয়েরে? ওরে! তুই যথাসময়ে মেয়ে বিয়ালে সে ওর সমান হত!

—শ্মশানের শকুনি যেন! এই শ্বশুর প্রাণ দিচ্ছে যাতে জামাই ধনী হয়, মেয়েরে যে মেরে ফেললি। শ্বশুর ছেড়ে দিবে?

মধুকরের মা বলল, বেটাছেলে কি বিচার করবে? আমি তোর মাথা মুড়ো বের করে দিব। আর বলে গেলাম! আজ হতে তোমার সঙ্গে আমাদের কারো রহনসহন নাই!

—আ গো! ও অহনা ছল করে কাঁদে, আর আতাপিসি তোমাদের লাগায়।

আতাপিসি এগিয়ে এসে বলল, অন্নদাসী বই তো নই। কোনদিন বলতে পারিনি তোমাদেরে।

তারপর বুকফাটা হাহাকারে শিকল খুলে দিয়ে বলে, দেখে যাও। এ মেয়ে কি বাঁচবে?

মাটিতে চাটাইয়ে ঘুমন্ত অহনা। মাথায় চাপ চাপ রক্ত, সর্বাঙ্গ কঞ্চির আঘাতে, ঝাঁটার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত, ঠোঁট দুটি ক্ষতবিক্ষত, ফোলা, পায়ের হাতের কোথাও কালসিটে বাদ নেই।

বেনে গিন্নি, বউ, মেয়েরা নির্বাক। তারা দেখে, চোখ ঢেকে বেরিয়ে যায় আসে, হনহন করে চলে যায়। যাবার কালে হরিমতী বলে যায়, মরে যদি, তবে ওর সাথে জীয়ন্ত তোরে বেঁধে ঘরে আগুন দিলে ঠিক হয়।

সবাই চলে যায়।

কনকা আতাপিসিকে বলে, তুমি রইলে কেন? তুমি যাও?

—তোর অন্নজল আর খাব না, কিন্তু এরে ছেড়ে যাব না।

কনকার মাথায় আকাশ ভাঙে যেন। বলে, তুমি! আর সঙ্গে কে?

পণ্ড নয়, মহাপণ্ড। সোনার বেনে, তাম্বুলি, রজক, নাপিত, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সকলকে আসতে হয়েছে।

বসুভূতি বলেন, যদুনন্দন! দ্রৌপদীর নির্যাতন থেকে কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। গণপতির ঘরে এই কাণ্ড চলেছে, তোমরা ঘুমাচ্ছ? ব্যাপারটা তোমার সমাজে আবদ্ধ নাই, বুঝেছ? ভুবন তামলীর ছেলের বিয়ে ভেঙে গেছে। যে গ্রামে বউ পিটায়, সে গ্রামে মেয়ে দিব না। গোটা দামিন্যায় কোন সমাজে মেয়ে দিতে ভয় পাবে মানুষ! আর অপুত্রক বেনে আর বউ যাতে না পায় সে আমরা দেখব।

—স্ত্রীলোককে শাস্তি দেই কি করে?

—ত্রিনয়নীতে ওর পিত্রালয়ে গেছ কেউ? গণপতির খোঁজে দিকে দিকে গেছ?

বেনেরা এ-ওর মুখের দিকে চায়।

—আমরা পরিষ্কার জানাচ্ছি, দামিন্যায় মহা দুর্দিন আসন্ন। তার কান্নায়····তার কান্নায়····

মুকুন্দ গভীর দুঃখে বলে, গণপতির বলুন, তার বড় বউয়ের বলুন, তেগুণার উপর বিশ্বাস যে খুব!

—বিশ্বাস সকলের। কিন্তু এমন কাণ্ড কার ঘরে হয় ঠাকুর? দুটো বিয়ে তো অনেকেরই।

যদুনন্দন বলে, মহাপণ্ড! এখান হতে ঘরে ফিরব না আমরা। মহাপণ্ডে ডাক পড়েছে বলে বাড়ির মেয়েরা ও বাড়ি দৌড়েছে দেখে এসেছি। এখান হতেই ত্রিনয়নী চললাম আমরা। মহাপাতক হয়ে গেল, মহাপাতক!

মুকুন্দ বলল, তোমার মা'রে বল যেন তারে দিনে রাতে পাহারা দেয়। জীবনটুকু রাখে।

বসুভূতি বলেন, মহাপণ্ডের নির্দেশ এটা।

সবাই চলে যেতে থাকে একে একে। মুকুন্দ মাথা নাড়ে। হায় দেশ! হায় সমাজ! হায় অহনা!

॥ ১২ ॥

অহনা চোখ মেলল, চোখ মেলতে বড় কষ্ট গো ! অচেতনে ছিল, সুখে ছিল। মায়ের কাছে বসে মাটির হাঁড়িবাসন নিয়ে রান্নাবাড়ি খেলছিল।

এখনো কি সে স্বপ্ন দেখছে ?

না, স্বপ্ন নয়। ঘরের কোণে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলছে। সে খাটে শুয়ে আছে। কলাপাতা বিছিয়ে তাকে শোয়াল কারা ?

সারা দেহে, হাতে পায়ে মলমের গন্ধ। কারা মলম মাখাল। মেঝেতে কারা শুয়ে আছে ?

আতাপিসি, যদুনন্দনের মা, গোপালদাসের পিসি। এ ঘরে এসে ঘুমাচ্ছে ? কি হয়েছে এ বাড়িতে ?

জানলা দিয়ে চাইল।

রাতের আকাশ, রাতের আকাশ। ওই তারাগুলি মৃগশিরা, ওই তারাগুলি সপ্তর্ষি, মা বলত, মানুষ পৃথিবীতে মরে, আকাশে তারা হয়ে ফুটে ওঠে।

মাথায় হাত দিল অহনা। না, টেনে টেনে চুল বাঁধে নি কেউ। বুঝি কোনো অষুদ তেল দিয়েছে।

কে এ সব করল ? কেন এত চেষ্টা ওদের ? অহনাকে কি ওরা নিয়ে যাবে ?

যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা।

তলপেটের যন্ত্রণা। আসছে, যাচ্ছে। আরো কি, আরো কি ?

হাত রাখল উরুর মাঝে।

প্রত্যাশিত রক্তধারা।

মাথার মধ্যে অন্ধকার নেমে আসছে, অন্ধকার। আ গো পাড়ার মানুষরা, তোমরা যদি জানতে অহনা গর্ভবতী, তাহলে কি কনকাকে এত নিষ্ঠুর হতে দিতে ?

কারো দোষ নেই, সব অহনার দোষ।

আমাকে বা কি ভূতে ধরেছিল, একবারও বলতে পারি নি, পেটে সন্তান, আমারে মারে।

কেমন করে বা বলতাম? তিন মাস না গেলে না কি বলতে নাই।

অহনা অস্ফুটে বলল, গা তবে খ'সে গেল!

হায়, শৈশব থেকে শুধু করতে নেই, বলতে নেই, নেই-নেই-নেই। ছুটে সাপখেলা দেখতে গেছি মা, বলেছ মল ঝামরে ছুটতে নাই।

ভিজা চুল বাঁধিনি তো বলেছ, এলো চুলে থাকতে নেই। জোরে হাসলে নিষেধ, চেঁচিয়ে দাদারে ডাকলে নিষেধ, কিছু "খাব না" বললে বলেছ, মেয়েছেলের ও কথা সাজে না।

যা বলেছ, যখন বলেছ, শুনেছি মা গো! যদি বলে দিতে স্বামীর বালিশে মন্ত্রপড়া অষুদ রাখলাম অহনা, স্বামী-সতীন দুয়ের সোহাগী হবি, তবে তো মা····

রক্তে কলাপাতা ভেসে যায় যে।

শয্যা যেন কাঁটা বেঁধে, দেহ হতে শক্তি যেন নেমে যায়, মাথায় সব বিশৃঙ্খল।

বুঝি ঢোল বাজে, কাঁসি বাজে কারা হুলাহুলি করে, মা বুঝি ডাকে, বলে, উঠ অহনা। আজ তোর দধিমঙ্গল। সারাদিন উপাসী থাকবি।

আবার সব নীরব, নিশুতি।

অতিকষ্টে, অমানবী শক্তিতে সন্তর্পণে নামল অহনা, দোর খুলল আস্তে।

জ্যোছনায় যেন ফুল ফুটেছে।

অঙ্গ জ্বলে যায় রে মা, অঙ্গে আগুন, আগুন! জ্যোছনায় নেমে দাঁড়াই, গা জুড়াই। চল মা ঘাটে যাই। স্নান করব, জল খাব, বুক জোড়া তেষ্টা রে মা, জল খাব।

অহনা কোথায়? এ তো মায়ের ঘর নয়, এ যে স্বামীর ঘর। স্বামীর ঘর? তাই হবে।

ওই, আরেকটু আগালে ঘাট। দীঘির জলে দেখ জ্যোছ্নায় ঢেউ খেলে। শীতল, শীতল জল, দীঘি! তুমি কাছে এসো। পা যে চলে না আর।

তলপেটে কে লোহার শলা বিঁধছে, অহনা বসে পড়ল। রক্তধারা বয়ে যায়, বয়ে যায়। আমারে ছেড়ে যাস না বাছা। তোর মা হব বলে আমারে আনল বান্যা। আমি যে তোর মা হব বলে বড় সাধ করেছিলাম, বড় নির্যাতন সয়েছিলাম, সতীন হাত তুললে পেটটি বাঁচাতাম।

যাবি তো আমারে নিয়ে যা বাছা। ঘরে স্বামী নাই, গর্ভে তুই নাই, অহনা কারে নিয়ে জীয়ে থাকবে?

অহনা মাটিতে বসল, শুয়ে পড়ল।

সকালে আতাপিসি অহনাকে সবার আগে দেখেছিল।

গণপতি যখন ত্রিনয়নীতে ঢুকেই জানল যে আজ আড়াইমাস অহনা নেই, সে ক্রুদ্ধ বাঘের মত ভীষণ গর্জনে বলেছিল, অহনা গর্ভবতী তা কনকা জানত।

—কনকা জানত হে সমাজ! কনকা জানত! আজ ওরেও কাটব, নিজেও আত্মঘাতী হবো!

এমন কথা বলতে বলতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গণপতি দামিন্যায় ঢোকে।

কিন্তু তার ভিটা তো ততদিনে পরিত্যক্ত, পোড়ো, বিজুবন।

—কনকা কোথায় যদুনন্দন?

—নাই।

—নাই?

—সে....বাঁশবনের ওপারে চালতাগাছে....আমরা শ্মশানে.... মেয়েরা তারে ঘেরে রেখেছিল....সে সবারে লাথ মেরে চলে যায়....

—তবে আমি দামিন্যায় কি করব? অহনা নাই, তবে আমি দামিন্যায় কি করব?

এ কথা বলতে বলতে, মাথা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সে চলে যায়। হাহাকারে বলতে বলতে যায়, দামিন্যায় মানুষ নাই রে! অহনারে কেউ বাঁচাল না রে! ঠাকুর নাই, দেবতা নাই, মানুষ নাই!

অকাল বর্ষণে গাছপালা জন্মে গণপতি বেনের ভিটে এখন বিজুবন। চোরেও ঢোকে না, ডাকাতও পড়ে না।

আতাপিসি এখন মন্দিরের সামনে ভিক্ষা করে। রাতে গাছতলায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকে।

বেনেপাড়ার মেয়ে বউ অন্য ঘাটে জলে নামে, অহনাদের ঘাট এখন পরিত্যক্ত।

দু'মাস বাদে মুকুন্দ তার মৌনব্রত ভাঙল। দু'মাস সে পারত-পক্ষে কথা বলত না কারো সঙ্গে, না ঘরে, না বাইরে।

অনেকদিন বাদে মুকুন্দ বউকে ডাকল। বউ এসে দাঁড়াল।

—ও জানলা খুললে?

—এখন তো কেউ কাঁদে না।

—না····কে কাঁদবে!

—সত্যিই দামিন্যায় আমরা অমানুষ বটি। গণপতি মিছে বলে নি।

—এখন বলে লাভ?

—আজ····জলে দাঁড়িয়ে জপ করতে করতে একটা কথা মনে জানলাম।

—কি কথা?

—অহনার····সকল কথা····আমি লিখে যাব বউ। কোনদিন তো পাঞ্চালী লিখব····তারে ইহকালে কোন সাহায্য করতে পারিনি···· পাঞ্চালীতে তারে····তারে····হতভাগী বড় কষ্ট পেয়ে গেছে বউ!

মুকুন্দ কেঁদে ফেলল।

বউ আস্তে বলল, পাঞ্চালীতে তারে স্বামীপুত্রও দিও। হতভাগীর বড় সাধ ছিল।

—যদি লিখি, নিশ্চয় দিব।

দুজনেই চেয়েছিল গণপতির ভিটার দিকে। সেখানে গাছগুলি তেমনই সবুজ, ঘরের চালে পাখি তেমনই বসছে, দীঘি যতটুকু দেখা যায়, জল তেমনই টলটলে।

মুকুন্দর আজ প্রথম মনে হল, প্রকৃতি বড় উদাসীন, বড় বৈরাগী, অহনাকে মনে রাখে নি। কোথাও বেনে বউ পাখি ডাকছিল আর ডাকছিল।